#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

দ্য SUBTLE আর্ট অফ নট গিভিং A F*CK

A COUNTERINTUITIVE APPROACH TO LIVING A GOOD LIFE

মার্ক ম্যানসন

Audifeel

AUDIFEEL EDITION

SUBSCRIBE TO AUDIFEEL

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

চেষ্টা করো না

চার্লস বুকোওস্কিকে সুচরিত্রের অধিকারী বলা যাবে না কোনভাবেই; মদ্যপ, নারীবাজ, ফুর্তিবাজ একজন মানুষ সে। পরামর্শ বা অনুপ্রেরণা পেতে চান, এমন মানুষের একটা তালিকা প্রস্তুত করলে তালিকার একদম নিচের দিকে থাকবে তার নাম।

সুতরাং, তাকে দিয়েই শুরু করা যাক।

লেখক হওয়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল বুকোওস্কির। কিন্তু প্রায় সব ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, জার্নাল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তিনি, কোন প্রকাশকই তার লেখা ছাপাতে চাননি। যতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, ততই মদের প্রতি আসক্তি বেড়েছে। এই অভ্যাস বয়ে নিয়েছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

ডাক বিভাগে কাজ করতেন বুকোওস্কি। বেতন কম ছিল, সেটারও বেশিরভাগ চলে যেত মদের পিছনে। আর বাকিটুকু যেত বাজির নেশায়। প্রতি রাতে একা একা মদ পান করতেন, সেই সাথে টাইপরাইটারে কবিতা লিখতেন মাঝে মধ্যে। রাতে জ্ঞান হারিয়ে সকালে ফিরেছে এবং তখনও মেঝেতে শুয়ে আছেনএরকমটা হয়েছে অনেকবার।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তবে তার বয়স যখন পঞ্চাশ, সে সময় তার বিষাদময় জীবনে একটি সুযোগ আসে। ছোটখাটো এক প্রকাশনীর সম্পাদক তাকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হন। বুকোওস্কিকে খুব বেশি অর্থ বা কাটতির কোন প্রতিশ্রুতি দেননি তিনি, হতাশা ও ব্যর্থতায় নিমজ্জিত এক লেখককে একটি সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু বুকোওস্কির জন্য সেটিই ছিল প্রথম সুযোগ। তিনি সেই সম্পাদককে লিখে পাঠান, আমার কাছে দুটো রাস্তা খোলা আছে। হয় ডাক বিভাগের কাজ করতে করতে পাগল হয়ে যাওয়া, অথবা লেখালেখি করে অনাহারে থাকা। আমি অনাহারে থাকার পথই বেছে নিলাম।

এর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে বুকোভস্কির প্রথম উপন্যাস বের হয়, উপন্যাসের নাম ছিল 'পোস্ট অফিস'। উৎসর্গ অংশে তিনি লিখেছিলেন, 'কারো প্রতি উৎসর্গীকৃত নয়।

বুকোওস্কি পরে আরও ছয়টি উপন্যাস এবং প্রায় শ;খানেক কবিতা লিখেছিলেন। প্রায় ২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে তার বই। তার জনপ্রিয়তা নিজের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যায়।

বুকোওস্কির মতো মানুষের গল্পগুলো আমাদের সমাজে বহুল প্রচারিত। তার গল্প চিরায়ত আমেরিকান স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য একজন মানুষের নিরন্তর লড়াই করে যাওয়া, হাল না ছেড়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো। ঠিক যেন রূপালী পর্দার ছবি। এ ধরনের গল্পে আমরা সবাই বিমোহিত হই৷ 'দেখো সবাই! এত বাধা সত্ত্বেও উনি দমে যাননি কখনো, শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন। আত্মবিশ্বাসের উপরে আস্থা রেখে নিজের লক্ষ্য জয় করেছেন'।

তবে মজার ব্যাপার হলো, বুকোওস্কির সমাধিফলকে লেখা হয়েছে, 'চেষ্টা করো না"।

বইয়ের এত বিক্রি আর জনপ্রিয়তাও তাকে ব্যর্থতার খোলস থেকে বের করতে পারেনি। তার এই সফলতার পিছনে কোন একাগ্রতা ছিল না। তিনি নিজেও সেটা জানতেন,খোলাখুলি স্বীকারও করে গেছেন। তিনি যা, নিজেকে সেভাবেই উপস্থাপন করতেন। হুট করে দুর্দান্ত লেখা শুরু করেছিলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। খুব সহজ, সাধারণভাবে লিখতেন তিনি, বিশেষ করে নিজের ব্যর্থতার ব্যাপারে লিখে গেছেন দ্বিধাহীনভাবে।

ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়ে বুকোওস্কি সফলতা অর্জন করেছেন। অবশ্য তিনি সাফল্য নিয়ে চিন্তা করতেন না। খ্যাতি লাভের পরেও কবিতার পাঠের আসরে গেলে মানুষ তাকে গালমন্দ করত। সুনাম কিংবা সফলতা কোনটিই তাকে ভালো একজন মানুষে পরিণত করতে পারেনি। ভিন্নভাবে যদি বলা যায়, এত সুনাম বা সফলতা কোনটিই তার ভালোমানুষীর জন্য নয়।

এটা ঠিক যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সফলতা অনেক ক্ষেত্রেই একসাথে ঘটে। তবে তার মানে এই নয় যে, তা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবাই ইতিবাচকতার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সবসময় শুধু 'সুস্থ থাকুন, 'সুখে থাকুন', 'অন্য সবার থেকে এগিয়ে থাকুন৷ অগ্রগামী, বুদ্ধিমান, ধনী, সুন্দর হওয়ার দিকেই যেন সবার সব নজর। সেই সাথে বেশি প্রশংসিত হবার ব্যাপার তো আছেই।

আপনি অর্থ উপার্জনের সবচেয়ে ভালো পথটি খুঁজে মরছেন কেন? কারণ, আপনি জানেন যে আপনার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নেই। আপনি প্রতিদিন আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে সুন্দর দাবি কেন করছেন? কারণ, আপনি নিজেকে এখনও যথেষ্ট সুন্দর ভাবতে পারছেন না। প্রেমের সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য পরামর্শ খুঁজে বেড়াচ্ছেন কী কারণে? কারণ ভালোবাসার উপযোগী একজন মানুষ হিসেবে ধরে নিতে পারছেন না নিজেকে। ফলে, প্রতিনিয়ত নিজেকে সফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিন্তা করে যাচ্ছেন। কারণ আপনি জানেন, সত্যিকার অর্থে আপনি এখনও সফল নন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইতিবাচকতার মূল উদ্দেশ্য থাকে কীভাবে আরও ভালো হওয়া যায়, কীভাবে সেরা হওয়া যায়। এতে করে আমাদের কোথায় শূন্যতা রয়েছে, সেটাই আসলে মনে করিয়ে দেয়া হয়। মনে করিয়ে দেয়া হয়, আমরা লক্ষ্য থেকে কতটুকু বিচ্যুত হয়েছি, লক্ষ্যে পৌছাতে আর কী করতে হবে। যে মানুষটি আসলেই সুখী, তার কোন প্রয়োজনই নেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুখী বলে যাওয়ার।

প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে, 'খালি কলসি বাজে বেশি। যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী, নিজেকে তার নতুন করে আত্মবিশ্বাসী প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তেমনি একজন ধনী মহিলারও নিজেকে বোঝানোর দরকার নেই যে তিনি ধনী। যে যেমন, সে তেমনই থাকবে। কেউ যদি সারাক্ষণ একই বিষয় নিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে,তবে বলতেই হয়, সে যা নয়, তা-ই হতে চাইছে সে।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনগুলোতেও একই চিত্র। ভালো জীবনযাপনের জন্য দরকার ভালো একটা কাজ। অথবা ভালো একটা গাড়ি । অথবা খুব সুন্দরী এক প্রেমিকা । অথবা বাচ্চাদের জন্য পুলের ব্যবস্থা করা। সবদিক থেকেই সুন্দর,সুখী জীবনের জন্য একটা ছক বাতলে দেওয়া হচ্ছে। যেন অনেক কিছু কিনলেই, অনেক কিছুর মালিক হলেই জীবন সুন্দর হয়ে যাবে। আপনার মাথায় প্রতিনিয়ত নানা রকম জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন, ভালো একটা টেলিভিশন কিনতে চান। সহকর্মীর থেকে ভালো একটা জায়গায় ছুটি কাটাতে চান। সুন্দর গহনা কিনতে চান, এমনকি সেলফি স্টিকও এ তালিকা থেকে বাদ নেই।

কেন নেই জানেন? আমার ধারণা, পুরোটাই ব্যবসা।

ব্যবসার সাথে আমার কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হলো, এত বেশি চিন্তা করাটা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শুভলক্ষণ নয়। এর ফলে আপনি বাহ্যিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। সুখ এবং পরিতৃপ্তির পিছনে জীবনটাই উৎসর্গ করে দিতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের জন্য এত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকা যায়।

হতাশার ভয়াবহ চক্র

মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত আপনার সাথে ছলনা করে যাচ্ছে। আপনি যদি সতর্ক না হন, তাহলে মস্তিষ্ক আপনাকে প্রচণ্ড অস্থির করে তুলবে। ধরুন, কারো সাথে সমস্যা চলছে আপনার, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে করে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন। এরপর আপনার মাথায় এলো, আপনি এভাবে দুশ্চিন্তা কেন করছেন? এখন আপনি দুশ্চিন্তা করা নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। তাহলে কোন জিনিসটা আপনাকে বেশি উদ্বিগ্ন করছে?

অথবা ধরুন, আপনি অনেক রাগী একজন মানুষ। তুচ্ছ বোকামি দেখলেও রেগে যান। এরকমটা যে কেন হয়, তা আপনি নিজেও জানেন না। এই অল্পতে রেগে যাওয়ার ব্যাপারটা আপনাকে আরও বিরক্ত করে তুলছে। এই রাগ যে আপনাকে একজন সঙ্কীর্ণ মানুষ বানিয়ে ফেলছে, তা আপনার অজানা নয়। আপনি এই ব্যাপারটাকে ঘৃণাও করেন। এতটাই ঘৃণা করেন যে নিজের উপরই অনেক রেগে যাচ্ছেন। সামান্য বিষয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এখন নিজের উপরই রাগ হলো আপনার। কী করবেন বুঝতে না পেরে দেয়ালে ঘুষি ছুড়লেন।

অথবা ধরুন, আপনি সবসময় সঠিক কাজ করা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা আপনাকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আবার ধরুন, অতীতের কোন এক ভুলের জন্য আপনার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। এমনকি অনুশোচনা করার জন্যও অনুশোচনা হচ্ছে। একাকী, বিষণ্ন হয়ে বসে থেকে আপনি আরও বিষণ্ন হয়ে পড়ছেন।

এটা হচ্ছে একটা চক্র। হতাশা, বিষণ্নতার চক্র। অনেকবারই আপনি এর মুখোমুখি হয়েছেন। এমনকি এখনও হয়তো এর ভিতরেই আছেন। ‘সবসময় এই চক্রের মধ্যে থাকি। দুর্ভাগা একজন মানুষ আমি। কাজটা এখনই বন্ধ করা উচিত । হায় খোদা! আমি নিজেকে দুর্ভাগা বলছি, আমি আসলেই একটা দুর্ভাগা! আবারও তাই বলছি। আমি আসলেই একটা দুর্ভাগা’।

শান্ত হোন। বিশ্বাস করুন, এই অংশটিই মানুষের মূল সৌন্দর্য। এই জগতের খুব কম সংখ্যক প্রাণীই এভাবে চিন্তা করতে পারে। আর কী চিন্তা করব, সেটা নিয়েও চিন্তা করতে পারি আমরা। যেমন, আমি ইউটিউবে মাইলি সাইরাসের

ভিডিও দেখতে চাইলাম। পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। কারণ, আমার মানসিকতা এতটা অসুস্থও নয়!

সমস্যাটা হয়েছে আমাদের ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেকে অনেক বেশি দেখানোর মানসিকতায়। এমন একটা প্রজন্ম গড়ে উঠেছে যারা ভাবে ভয়, দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা এসব আবেগ মোটেই স্বাভাবিক নয়। ফেসবুক খুললেই দেখবেন, খুব আনন্দঘন সময় কাটাচ্ছে সবাই। আর আপনি বাড়িতে বসে মাছি মারছেন। ভাবছেন আপনার জীবনটা এত বাজেভাবে চলছে কেন?

এই চক্রটা হচ্ছে এক মহামারীর মতো, যা কিনা আমাদেরকে আরও বেশি হতাশ আর বিষণ্ণ করে দেয়।

আমাদের পূর্বপুরুষরা যে এরকম চিন্তা করতেন না, তা নয়। কিন্তু তারা একে জীবনের অংশ হিসেবেই ধরে নিতেন। তারপর আবার কাজে নেমে পড়তেন।

কিন্তু এখন কীর্ঘটছে? আপনি পাঁচ মিনিট বিষণ্ন হয়ে বসে আছেন। শ;খানেক মানুষের হাসিখুশি, আনন্দময় জীবনের ছবি দেখছেন। খুব স্বাভাবিক আপনার মনে হবে, আপনার নিজের মাঝেই কোন সমস্যা রয়েছে।

এই অংশটা নিয়েই যত ঝামেলা। আমাদের মন খারাপ হওয়ার কারণে মন খারাপ হয়। অনুশোচনা হওয়ার কারণে অনুশোচনা হয়। রেগে যাওয়ার কারণে রাগ হয়। উদ্বিগ্ন হবার চিন্তা করে আরও উদ্বিগ্ন হই। আমাদের সমস্যাটা কোথায় আসলে?

সুতরাং, অতিরিক্ত চিন্তা না করলেই মুক্তি মিলবে। পৃথিবীতে সমস্যা থাকবেই, আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। সেগুলো মেনে নিয়েই এগোতে হবে।

নিজের খারাপ লাগাকে গুরুত্ব না দিলেই হতাশার এই চক্র ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবেন আপনি। নিজেকে তখন বলবেন, 'খারাপ লাগছে বটে, কিন্তু সেটাকে এত পাত্তা দেয়ার কী আছে?' তখনই জাদুর মতো একটা ব্যাপার ঘটবে,নিজেকে আপনি আর ঘৃণা করবেন না।

জর্জ অরওয়েলের একটা উক্তি আছে। 'ভবিষ্যতে কী ঘটবে, তা দেখার জন্য প্রতিনিয়ত কষ্ট করতে হয় আমাদের'। দুশ্চিন্তা ও চাপ থেকে মুক্তির পথ আমাদেও সামনেই আছে। কিন্তু আমরা সে দিকে মনোযোগ দিতে পারছি না। কারণ আমরা বিজ্ঞাপন আর পর্ণো ছবি দেখাতেই বেশি ব্যস্ত।

ইন্টারনেটে 'উন্নত বিশ্বেও সমস্যা নিয়ে আমরা মজা করি। কিন্তু আসলে নিজেদের সাফল্যে নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। সবারই ফ্ল্যাট স্ক্রিন

টেলিভিশন আছে, বাজার-সদাইওঘরে বসেই করা যাচ্ছে। অথচ গত ত্রিশ বছওে মানসিক চাপ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যা, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা আকাশচুম্বী হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের সমস্যা এখন আর বস্তুগত নয়। ব্যাপারটা এখন আধ্যাত্মিক পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমরা পড়ে গেছি অস্তিত্ব সংকটে। আমাদের সামনে প্রচুর সুযোগ এবং একই সাথে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় আমাদের। এ কারণেই হতবুদ্ধিকর অবস্থায় রয়েছি আমরা।

আমাদের দেখার এবং জানার সীমানা এখন অসীম। আমরা যে তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না, আমরা যে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই, তা জানার সুযোগও এখন উন্মুক্ত। ফলে এই বিষয়গুলো আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে।

গত কয়েক বছরে ‘কীভাবে সুখী হতে হয়’ । এই নামের শিরোনামের আর্টিকেলটি ফেসবুকে আট মিলিয়নবার শেয়ার হয়েছে।

অতিরিক্ত ইতিবাচকতার পিছনে ছোটার মানসিকতাটাই একটা নেতিবাচক বিষয়। একইভাবে চক্রাকারে, নিজের নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিতে পারাটাও ইতিবাচক বিষয়।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে আরেকবার পড়ুন। এই জিনিসটাই দার্শনিক অ্যালান ওয়াটস তার ‘ব্যাকওয়ার্ডল’তে বলতে চেয়েছেন। সুখী হবার জন্য যত একাগ্র হবেন আপনি ততই কম সুখী হবেন। এই মানসিকতা আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দেবে যে, আপনি সুখী নন। আপনি যত ধনী হতে চাইবেন, আপনি নিজেকে ততই দরিদ্র হিসেবে আবিষ্কার করবেন। নিজেকে যত আবেদনময়ী করে তুলতে চাইবেন, নিজের কাছে আপনাকে ততটাই কুৎসিত মনে হবে। আপনার সত্যিকারের অবয়ব তখন আর মুখ্য থাকবে না। মরিয়াভাবে সবার ভালোবাসা এবং সঙ্গ চাইবেন, অনেক মানুষের ভিড়েও একাকী বোধ করবেন। কিছু অর্জন করতে গিয়ে নিজেকে আরও সংকীর্ণ করে ফেলবেন।

আমি এলএসডি মাদকটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। সুখকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কোন লাভই হয়নি।

যেমনটা অ্যালবার্ট কাম্যু বলেছেন ‘সুখের উপাদান খোঁজার পিছনে ছুটলে আপনি কখনো সুখী হতে পারবেন না। জীবনের অর্থ খুঁজতে থাকলে জীবনটাই উপভোগ করতে পারবেন না’। তিনি যে সে সময় এলএসডির উপরে ছিলেন না, সে ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

আরও পরিষ্কার করে বললে, চেষ্টাই করো না।

আপনি এই মুহূর্তে কী ভাবছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। মার্ক, আপনার কথা আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমি যে ক্যামারো গাড়ি কেনার জন্য

টাকা জমাচ্ছি, তার কী হবে? মজবুত শরীরের জন্য না খেয়ে থাকছি? অথবা লেকের পাড়ে যে বিশাল বাড়ির স্বপ্ন দেখছি? আমি যদি এসব নিয়ে এখন চিন্তা করাই বন্ধ করে দিই, তাহলে আমার আর কিছুই পাওয়া হবে না। আমি তো সেটা হতে দিতে পারি না।

এত প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

কখনো খেয়াল করেছেন কি, যখন কোন বিষয় নিয়ে আপনি কম চিন্তা করেন, সেই কাজটি আপনি অনেক ভালোভাবে করতে পারেন? লক্ষ্য করে দেখবেন, অনেকে সাফল্যের দিকে বেশি মনোযোগ না দিয়েই তা পেয়ে গেছেন। ঝামেলাকে না বলুন, সবকিছু সুন্দরভাবে হয়ে যাবে।

কারণ কী?

ব্যাকওয়ার্ড ল'কে ব্যাকওয়ার্ডল বলার পিছনে কারণ রয়েছে। ঝামেলাকে না বলাটা উল্টো দিক থেকে কাজ করে। যদি ইতিবাচক তার অনুসরণ করা নেতিবাচক হয়ে থাকে তবে নেতিবাচক তার অনুসরণ করাও ইতিবাচক। জিমে গিয়ে আপনি যে কষ্ট করছেন তার ফলাফল হিসেবে পাচ্ছেন সুন্দও শারীরিক গঠন এবং সুস্বাস্থ্য। ব্যবসায় ব্যর্থতা এলে বোঝা যায়, কোথায় পরিবর্তন আনলে সফল হওয়া যাবে। আপনার অনিরাপদবোধ আপনাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। আশপাশের মানুষের কাছে করে তুলবে আরও আকর্ষণীয়। ভয় এবং উদ্বেগই আপনাকে অধ্যবসায়ী এবং সাহসী করে তুলবে।

আরও কথা বলতে পারি। কিন্তু এতক্ষণে বিষয়টি বুঝতে পারার কথা আপনার ।জীবনে যা কিছু অর্জন তা এই নেতিবাচকতাকে কাটিয়েই পেয়েছেন। নেতিবাচকতাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে তা বরং উল্টো ফল বয়ে আনবে। যন্ত্রণাকে এড়িয়ে চলাটাও এক প্রকার যন্ত্রণা। কষ্ট করতে না চাওয়াটাই কষ্ট বয়ে আনে।ব্যর্থতাকে অস্বীকার করাটাও ব্যর্থতা। লজ্জাকে লুকিয়ে রাখাটাই একটা বড় লজ্জা।

দুঃখ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে মুছে ফেলা শুধু অসম্ভব নয়, সেইসাথে ভয়ানক একটা ব্যাপারও বটে। একে মুছে ফেলতে গেলে বাকি সবও মুছে যাবে। দুঃখকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা মানে দুঃখকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছেন কিন্তু আপনি যদি দুঃখকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব না দেন, ভেবে নেন দুঃখ পাওয়াটাই স্বাভাবিকতার অংশ, তাহলে আপনি হয়ে উঠবেন অপ্রতিরোধ্য।

আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়েই অযথা ঝামেলা বাড়িয়েছি। আবার অনেক বিষয়ে ঝামেলা হেঁটেও ফেলেছি। ঝামেলাগুলো ছেঁটে ফেলাটাই আমার জীবনে ভূমিকা রেখেছে।

আপনি এমন অনেককে নিশ্চয়ই চেনেন যারা ঝামেলাকে ছেঁটে ফেলে সফল হয়েছেন। হয়তো আপনার জীবনেও এমন এক সময় ছিল, যখন আপনি ঝামেলাকে না বলতে পারতেন। তখন কিছু একটা অর্জন করেছিলেন।

আমার 'কাঁধ থেকে ঝামেলা নামিয়ে ফেলার' তালিকার প্রথম দিকে আছে। চাকরি ছেড়ে ইন্টারনেটে ব্যবসা শুরু করা। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে আসা। আমি কি খুব মাথা ঘামিয়েছি? উত্তর হবে,না। ভাবা মাত্র চলে এসেছি।

এই সিদ্ধান্তগুলোই আসলে আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যেমন, কলেজ ছেড়ে দিয়ে রক ব্যান্ডে যোগ দেয়া। কিংবা আপনার নির্বোধ বয়ফ্রেন্ডকে ছেড়ে দেয়া।

ঝামেলামুক্ত থাকা মানে জীবনের ভয়াবহ এবং কঠিনতম সিদ্ধান্তগুলো নিঃসঙ্কোচে বাস্তবায়ন করা।

যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়ার মতো না, তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েই আমরা ঝামেলায় পড়ি। গ্যাস স্টেশনের কর্মী ভাংতি দিলেও আমাদের সমস্যা। পছন্দের টেলিভিশন অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলেও আমরা বিরক্ত হই। এমনকি আমাদের সহকর্মী যদি আমার চমৎকার উইকেন্ডের কথা না জিজ্ঞেস করে তাহলেও আমরা বিরক্ত হই।

অন্যদিকে আমাদের ক্রেডিট কার্ড খালি হচ্ছে, পোষা কুকুরটাও আমাদের পছন্দ করে না। আমাদের থেকে বয়সে ছোটরা বাথরুমে বসে মাদক নিচ্ছে। আর আমরা বসে আছি খুচরা পয়সা ও এভরিবডি লাভস রেমন্ড (টিভি শো) নিয়ে।

এভাবেই চলছে সবকিছু। একদিন আপনি থাকবেন না। এটা অবশ্যম্ভাবী এক ঘটনা, তবুও ভুলে যেতে পারেন ভেবে বলে রাখলাম। মনে করুন, আপনি এবং আপনার পরিচিত সবাই খুব শীঘ্রই মারা যাবেন। আর এই অল্প সময়ে খুব কম জিনিস নিয়ে আপনার ঝামেলা করা উচিত। আপনি যদি সবার সাথে সব বিষয় নিয়ে সমস্যা তৈরি করতে যান, তবে আপনি সত্যিই ঝামেলায় পড়ে যাবেন।

ঝামেলামুক্ত থাকার কিছু সূক্ষ্ম পথ রয়েছে। কথাটা কিছুটা হাস্যকর শোনাতে পারে, আপনি আমাকে আহাম্মকও ভাবতে পারেন। আমি এখানে যা বলছি তা আপনাকে বিভিন্ন বিষয়াদি তাদের গুরুত্ব অনুসারে সাজাতে সাহায্য করবে। আর এটা করবেন আপনার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের মাধ্যমে। আপনার কাছে কোন জিনিষের গুরুত্ব আছে, কোন জিনিষের গুরুত্ব নেই। গুরুত্বটা সারাজীবনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। প্রতিনিয়তই হোঁচট খাবেন আপনি। আর এই লড়াইটাই যে কারো জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হয়তোবা এটিই একমাত্র সত্যিকারের লড়াই ।

আপনি যদি সবার সাথে সব বিষয় নিয়ে সমস্যা করতে যান, মনে হবে আপনাকে সর্বদা খুশি থাকার অধিকার দেয়া হয়েছে। আর সবকিছু ঠিক আপনি যেভাবে চান, সেভাবেই ঘটতে হবে। এটা এক প্রকারের অসুস্থতা বৈকি। আর এই অসুস্থতা আপনাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। সমস্ত দুর্দশাকেই অন্যায় বলে মনে করবেন। প্রতিটি বাধাকে ব্যর্থতা, আর মতের বিরোধ হলেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হবে। নিজের হাতে তৈরি করানরকে ঘূর্ণিপাক খেতে থাকবেন আপনি।

হতাশাকে না বলার মন্ত্র

যে ব্যক্তি সবকিছু ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করতে পারে সে অযথা ঝামেলায় জড়ায় না। কোন সমস্যাই তাকে টলাতে পারে না। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আবেগশূন্য, তার জন্য বিশেষ একটা নাম আছেঃ সাইকোপ্যাথ। আপনি কেন একজন সাইকোপ্যাথের সমকক্ষ হতে চাইবেন? আমি তো চিন্তাও করতে পারি না। ঝামেলা এড়িয়ে চলা বলতে আসলে কী বোঝায়? তিনটি ছোট ঘটনা দেখে নিই,তাহলে বিষয়টি বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

কৌশল ১

ঝামেলা এড়িয়ে চলা মানে নিঃস্পৃহ হয়ে যাওয়া নয়; অন্যরকম হওয়াটাকে সহজভাবে মেনে নেয়া।

নিঃস্পৃহ হয়ে যাওয়ার মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং প্রশংসার কিছু থাকতে পারে না। নিঃস্পৃহ লোকেরা ভীরু, কাপুরুষ এবং হাস্যকর। তারা সবকিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করে বলেই নিঃস্পৃহ হওয়ার চেষ্টা করে। লোকে তাদের চুল দেখে কী ভাববে, এইভেবে তারা কখনো চুলও আঁচড়ায় না। লোকে তাদের চিন্তা ভাবনাকে কীভাবে গ্রহণ করবে এই চিন্তা করেই তারা নিজের বানানো নিয়মের মাঝে বন্দী থাকে। কাউকে নিজেদের কাছে আসতে দিতে ভয় পায়। নিজেদের বিশেষ মানুষ হিসেবে কল্পনা করে, যেন তাদের সমস্যাগুলো অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

পারিপার্শ্বিক সবকিছু নিয়ে ভয়ে থাকে তারা। এ অবস্থা তাদের নিজেদেরই তৈরি। এ কারণে তাদের অর্থবহ কোন চাহিদা নেই। নিজেদের তৈরি গর্তে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

সত্যি কথা হলো, ঝামেলাহীন থাকা বলতে আসলে কিছুই নেই। আপনি কোন না কোন বিষয়ে সমস্যা তৈরি করবেনই। প্রকৃতিগতভাবেই এটা আমাদের মাঝে আছে ।

প্রশ্ন হলো , আমরা কী নিয়ে এবং কোন বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাব? আর যে মাঝে আছেৃ বিষয়ের কোন গুরুত্ব নেই, তাকে কীভাবে ঝেড়ে ফেলব?

আমার মায়ের অনেকগুলো টাকা তার কাছের এক বন্ধু আত্মসাৎ করেছে। আমি কি নিঃস্পৃহ ছিলাম? আমি চাইলে আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোন এক টিভি সিরিজের নতুন সিজন ডাউনলোড করে বলতে পারতাম,'দুঃখিত,মা' ।

কিন্তু আমি রেগে গিয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, 'বাদ দাও তো! আইনজীবীর সাহায্যে ওই হারামজাদাকে দেখে নেব আমরা। দরকার পড়লে ওর জীবনটা ছারখার করে দেব'।

প্রথম বিষয়টি দেখালাম। যখন আমরা বলি, 'মার্ক ম্যানসনের কোন কিছুতেই আসে যায় না', তারমানে এই না যে, 'মার্ক ম্যানসন সব কিছু নিয়ে উদাসীন | আবার যখন বলি, 'লক্ষ্য পূরণের জন্য কষ্ট করতে কিছু আসে যায় না মার্ক ম্যানসনের'। তার মানে হলো, লোকে কী বলবে এই ভেবে সে তার কাজে ক্ষান্ত দেয় না। তার কাছে যা সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়,সে তা-ই করবে।

এই জিনিসটা প্রশংসনীয়। না,আমি আমার কথা বলছি না। এই যে দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার শক্তি, অন্যরকম হওয়ার ইচ্ছা, শুধুমাত্র নিজের মূল্যবোধের কারণে সমাজচ্যুত, জাতচ্যুত হয়ে যাওয়া। ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে তাকে মধ্যাঙ্গুলি প্রদর্শন করা, এ সবকিছুর কথাই বলছি।

যারা এগুলো করতে পারে, তারা জানে এটাই সঠিক কাজ। তারা জানে এটি তাদের আবেগ, অনুভুতির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। তারা শুধু অগুরুত্বপূর্ণ জিনিসই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরিবার, বন্ধু এবং লক্ষ্যকেই শুধু গুরুত্ব দেয়। যেহেতু তারা সঠিক জিনিসকেই গুরুত্ব দেয়, বিনিময়ে তারা মানুষের কাছ থেকেও গুরুত্ব পায়।

এখানে আরেকটি গোপন বিষয় রয়েছে। আপনি কখনোই অনেক মানুষের কাছে শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত হবেন না। অনেক মানুষের কাছে হাসির পাত্রেও পরিণত হবেন। কারণ দুর্ভাগ্যহীনতা বলে কিছু নেই। একই কথা ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনি যেখানেই যান না কেন, আপনার জন্য একগাদা ঝামেলা অপেক্ষা করবে। এটা কোন বিষয় না। আপনি একে কীভাবে মোকাবেলা করে নিজের খুশিমতো চলবেন সেটাই হলো মূল বিষয়।

কৌশল ২

প্রতিকূল পরিস্থিতি ঝেড়ে ফেলতে হলে এমন কিছু বের করতে হবে যা ঐ অবস্থার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

মনে করুন আপনি একটা দোকানে আছেন। সেখানে একজন বৃদ্ধা ক্যাশিয়ারের সাথে চিৎকার করে যাচ্ছে। কারণ সেবৃদ্ধা মহিলার ত্রিশ সেন্টের কুপন গ্রহণ করতে চাইছে না। আর ঐ বৃদ্ধা তার সাথে ঝগড়া করে চলেছেন। মহিলা এত ঝামেলা পাকাচ্ছেন কেন? মাত্র তো ত্রিশ সেন্টের ব্যাপার!

আমি বলছি, কেন? সম্ভবত ঐ মহিলার বাড়িতে তেমন কোন কাজ নেই। বাড়িতে একা একা বসে সারাদিন কুপন কেটে যান। তার সন্তানেরা তাকে দেখতেও আসে না। ত্রিশ বছর ধরে শারীরিক মিলন কী, জানেন না। সারা শরীরে শুধু অসুখ আর অসুখ। পেনশন এবং আয়ু দুটোই ফুরিয়ে এসেছে।

তাই তিনি বসে বসে কুপন সংগ্রহ করেন। এই একটা কাজই করার আছে তার। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই। ফলে ক্যাশিয়ার যখন কুপন নিতে অস্বীকৃতি জানায়, বৃদ্ধা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। 'আমাদেও সময়ে মানুষের আচরণ অনেক ভালো ছিল' এই ধরনের কথা ক্যাশিয়ারের উদ্দেশ্যে ধেয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিকই।

আপনি যদি খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান, যেমন-আপনার আগের প্রেমিকের ফেসবুকে দেয়া নতুন ছবি, টিভি রিমোটের ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া, তাহলে বুঝতে হবে আপনার আসলে যুক্তিসঙ্গত কোন ঝামেলা নেই। তখন তা আপনার জন্য সত্যিই এক সমস্যা।

একজন শিল্পীকে একবার বলতে শুনেছিলাম, কোন মানুষের যদি কোন সমস্যা না থাকে তবে সে এমনিতেই সৃজনশীল কাজ করতে পারে। আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের লোকেরা 'জীবনের সমস্যাকে' আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা না করার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ধরে নেয়।

অর্থবহ কিছু খুঁজে বের করে সময় ও শক্তির যথাযথ ব্যবহার করুন। আর যদি আপনি অর্থবহ কিছু খুঁজে না পান, তাহলে অর্থহীন এবং নগণ্য ঝামেলাতেই আপনার সকল সময় নষ্ট হবে।

কৌশল ৩

জেনে হোক আর না জেনেই হোক, কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেবেন তা আপনি নিজেই ঠিক করছেন।

টুপির নীল রঙ মনমতো না হওয়ায় কোন বাচ্চাকে কেঁদে চোখ দিয়ে বের করতে দেখেছেন কখনো? দেখেননি?আচ্ছা, বাদ দিন ঐ বাচ্চার কথা।

যৌবনে আমাদের সবকিছু নতুন এবং চাকচিক্যময় লাগে। তাই সবকিছুই আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাড়ায়। লোকে আমাকে নিয়ে কী ভাবছে, ঐ ছেলে বা মেয়েটা আমাকে ফোন করল কিনা, মোজার রঙ বাকি সবকিছুর সাথে মানাচ্ছে কিনা, এমনকি জন্মদিনের বেলুনের রঙটাও এর থেকে বাদ যায় না।

বয়সের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, সেই সাথে বয়ে যায় সময়ও। আর আমরা বুঝতে শিখি, আমাদের জীবনে এসব জিনিষের আসলে কোন গুরুত্বই নেই। আগে যাদের মতামত অনেক বেশি গুরুত্ব পেত, সেগুলো আস্তে আস্তে আর কোন ভূমিকাই রাখে না। প্রত্যাখ্যাত হলে, তাৎক্ষণিকভাবে একটু কষ্ট পেলেও আমাদের জন্য তা ভালো ফলই বয়ে আনে। মানুষ আমাদের বাহ্যিকতার দিকে কতটাকম গুরুত্ব দেয়, তা বুঝতে শিখি। আমরাও নিজেদের শুধরে ফেলি।

আস্তে আস্তে আমরা ঝামেলার বিষয়গুলো কমিয়ে আনি। এটিই পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার উদাহরণ। কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা বুঝতে পারাটাই পরিপক্কতার শিক্ষা।

মধ্যবয়সে এসে আমাদের মাঝে পরিবর্তন আসে। আমরা প্রাণোচ্ছলতা হারিয়ে ফেলি। নিজেদেরকে বুঝতে শিখি,তারপরে এভাবেই মেনে নিই। যেসব বিষয় নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত নই, মেনে নিই সেগুলোও।

এটা এক হিসেবে মুক্তির দুয়ার খুলে দেয়। আমাদের আর সব বিষয় নিয়ে ঝামেলায় জড়াতে হয় না। জীবনটা এভাবেই চলতে থাকে। বুঝে যাই, আমরা ক্যান্সার নিরাময় করতে পারব না। চাঁদেও যেতে পারব না। পরিবার, বন্ধু আর গলফ কোর্টেই নিজেদের বেঁধে ফেলি । অবাক করার মতো বিষয় হলো, এগুলোই আমাদের জীবনে যথেষ্ট হয়ে যায় তখন। জীবনের এই সরলীকরণ করাটাই আমাদের কাছে অবারিত সুখ হয়ে ধরা দেয়। সেই সাথে ভাবতে থাকি, বুকোওস্কি যথার্থই বলেছেন, ‘চেষ্টা করো না ।

মার্ক, এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্যটা কী?

এই বই আপনাকে সহজভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। আপনার জীবনে কোন জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা বুঝতে সাহায্য করবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেরে যাওয়ারও যে দরকার আছে, তা এখন মানুষ আর জরুরী বলে মনে করে না। আমার মনে হয়, এই মানসিক অবস্থা মহামারী আকার ধারণ করেছে। আজগুবী শোনালেও বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ আমরা যখন হেরে যেতে অস্বীকৃতি জানাই, তখন আমরা নিজেদেরকে দোষ দিতে থাকি। আমরা ভাবতে থাকি, আমাদের মাঝেই আসলে সমস্যা রয়েছে। ফলে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করি, যার ফলে সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে। সেই হতাশার চক্র।

ঝামেলা থেকে দূরে থাকার মানসিকতা আমাদের জীবনকে নতুন করে সাজাতে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষের পার্থক্য করতে পারি। এই পার্থক্য করার ক্ষমতাটাকেই আমি 'বাস্তবতার জ্ঞান' বলতে চাই । বাস্তবতার জ্ঞান বলতে আমি বুঝি,অনিবার্য কিছু সমস্যা মেনে নেয়া। আপনি যা কিছুই করেন না কেন, জীবনে ব্যর্থতা, দুঃখ, কান্না এমনকি মৃত্যু থাকবেই।প্রকৃতি আপনার দিকে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ছুঁড়ে দেবেই। আপনি যখন এসব মেনে নিতে শিখবেন, আপনার কাঁধ থেকে ঝামেলার বোঝা নেমে যাবে।দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে, প্রথমে আপনাকে দুঃখকে গ্রহণ করা শিখতে হবে।

কোনরকম ভণিতা না করেই বলা যায়, আপনার দুঃখ লাঘব করা নিয়ে এই বইয়ের কোন মাথাব্যথা নেই। এই বইতে আপনি মহামানব হওয়ার কোন উপায় লেখা পাবেন না। সেটা সম্ভবও নয়। কেননা মহামানব বলে আদতে কিছু নেই। এটা আমাদের মনের এক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপরও এই বই আপনার দুঃখকে অস্ত্রে পরিণত করবে, আপনার শোককে শক্তিতে পরিণত করবে। আপনার সমস্যাগুলোর তীব্রতা কিছুটা হলেও কমিয়ে আনবে। এটিও একপ্রকার উন্নতি। একে যন্ত্রণা মোকাবেলা করার পাথেয় হিসেবে ভাবুন।

কীভাবে কিছু অর্জন করতে হয়, এই বই আপনাকে সেই জ্ঞান দেবে না। বরং কীভাবে ঝামেলাকে না বলতে হয়, তা নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা হবে। চোখ বন্ধ করে ভাবুন। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। জীবনে হোঁচট খেয়েও আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখ যখন অসুখ

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হিমালয়ের পাদদেশে, অর্থাৎ, আজকের দিনের নেপালে প্রবল ক্ষমতাধর এক রাজা বাস করতেন।অনাগত সন্তানের জন্য বিশেষ এক পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সন্তানের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন,বিন্দু পরিমাণ দুঃখও যেন সে না পায়।সন্তানের সকল প্রয়োজন, সকল ইচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

প্রাসাদের চারপাশে তৈরি করা উঁচু প্রাচীর শিশুটিকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। অতি যত্নে শিশুটি নষ্ট হয়ে যায়। শুধুমাত্র তার সকল ইচ্ছে, সকল চাওয়া পূরণ করার জন্য প্রচুর কর্মচারী রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনা করেই শিশুটিকে স্বাভাবিক মানুষের থেকে আলাদা করে গড়ে তোলা হয়।

এভাবেই পুরো শৈশবটা কেটে যায় রাজপুত্রের। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য!এত ঐশ্বর্য, এত বিলাসিতার পরও একজন হতাশ যুবকে পরিণত হয় সে। পুরো জীবনটাই মূল্যহীন হয়ে পড়ে তার কাছে। এত যত্নআত্তিও তার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তাকে বন্দী করে রাখা দেয়ালের বাইরের পৃথিবীকে দেখতে এক গভীর রাতে প্রাসাদ থেকে লুকিয়ে বের হলো সেই রাজপুত্র। একজন ভৃত্যকে নিয়ে একটা গ্রাম ঘুরে দেখল সে। সবকিছু দেখেশুনে ভয় পেয়ে গেল ।

জীবনে প্রথমবারের মতো মানুষের দুঃখ কী জিনিস, তা সে বুঝতে পারল। জরাগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত, গৃহহীন, মৃত্যু পথযাত্রী লোক দেখে শিউরে উঠল সেই রাজপুত্র।

প্রাসাদে ফিরে এক প্রকার অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে লাগল সে। নিজের দেখা দৃশ্যগুলো কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। অন্য যুবকদের মতোনিজের পিতাকেই সবকিছুর জন্য দায়ী করতে থাকল সে। অতি বিত্তবৈভবই তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, ধরে নিল সেই রাজপুত্র। পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু পিতার মতো নিজের অজান্তেই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রাজপুত্র। শুধু পালিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হলোনা, সাথে রাজকীয় উপাধি, পরিবার ও সমস্ত

সম্পত্তি ছেড়ে দিল সে।পথের নোংরা পরিবেশে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। ক্ষুধার্ত অবস্থায়, নিজেকে কষ্ট দিয়ে, আর ভিক্ষে করে তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার চিন্তা করল।

পরের রাতে আবারও লুকিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হলো রাজপুত্র। তবে এবার আর সে ফিরল না। বেশ কয়েক বছর ভিখারির মতোজীবন কাটাল। নিজের পরিকল্পনা মতো অনেক কষ্টও স্বীকার করল। পুড়তে লাগল রোগ, ক্ষুধা, একাকীত্বের যন্ত্রণায়।

এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল, কিন্তু কিছুই হলো না। রাজপুত্র হঠাৎ লক্ষ্য করল, এভাবে কষ্ট করাটা কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না। প্রত্যাশিত অন্তর্দৃষ্টি অধরাই রয়ে গেছে এখনও। জগতের গভীর কোন মর্ম সে বের করতে পারছে না।

রাজপুত্র বুঝতে পারে, যন্ত্রণা আসলে একটা ফালতু জিনিস। অর্থহীন এক জিনিস। সে বুঝতে পারল, পিতার মতো তার পরিকল্পনাও সফল হলো না। এর চেয়ে তার অন্য কিছু করা উচিত।

দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিল। নতুন কোন পরিকল্পনা বের করতে না পারা পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কথিত আছে, বিভ্রান্ত সেই রাজপুত্র ওই গাছের নিচে ঊনপঞ্চাশ দিন বসে ছিল। এক জায়গায় টানা ঊনপঞ্চাশ দিন বসে থাকা বৈজ্ঞানিকভাবে সম্ভব কিনা আমি সেদিক খতিয়ে দেখতে চাইছি না। বিষয়টা হচ্ছে, সে সময় রাজপুত্রের মাঝে কিছু গভীর উপলব্ধি আসে। এর মাঝে একটি হলো, জীবন মানেই যন্ত্রণা। ধনীরা তাদের প্রাচুর্যের কারণে ভোগে। গরিবেরা ভোগে অর্থাভাবে। পরিবারহীন মানুষ হয় পরিবার না থাকার বেদনায় কাতর। আর যাদের পরিবার আছে, তারা পরিবার থেকে মুক্তি চায়। পার্থিব সুখের খোঁজে থাকা মানুষ সুখের নেশায় দুঃখ স্বীকার করে। আর যারা সবকিছু থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, তারা সেই কষ্টে থাকে।

সব ঝামেলাই যে সমান, তা বলছি না। ঝামেলাগুলোর মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য থাকে অবশ্যই। কিন্তু সেটাকে আমাদের মোকাবেলা করতেই হবে।

কয়েক বছর পর, রাজপুত্র নিজের দর্শন খুঁজে পায়, এবং পুরো বিশ্বে তা ছড়িয়ে দেয়। মূল মতবাদটা ছিল, জীবনে দুঃখ এবং ঝামেলা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। রাজপুত্র পরবর্তীতে বুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি

পান। কোন কারণে যদি আপনি তার কথা না শুনে থাকেন, তবে বলছি তিনি একজন মহামানব।

সুখ ব্যাপারটাকে ছকে ফেলার চেষ্টা করি আমরা। ব্যাপারটা অনেকটা লোগো সেট দিয়ে কিছু বানানোর মতো। এটার পরে ওটা রাখলে দারুণ কিছু একটা তৈরি হয়ে যাবে। ভাবি, এটা করতে পারলেই সুখী হবো আমি। অথবা ওটা করলেই সুখ ধরা দেবে আমার কাছে। অমুকের মতো হতে পারলে সুখের আর সীমা থাকবে না আমার।

এই যে ছকে ফেলার চেষ্টা, এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। সুখের কোন ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নেই। অসন্তোষ মানুষের প্রকৃতিগত একটা ব্যাপার। মানুষের সুখের উৎসই হচ্ছে এই অসন্তোষ। বুদ্ধ এটাকে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকতার সাথে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অধ্যায়ে আমিও সেটাই করব, তবে করব জীবতত্ত্ব দিয়ে, ব্যাখ্যা করব পান্ডাদের মাধ্যমে।

নিরাশকারী পান্ডার কাজকর্ম

আমি যদি কোন সুপারহিরো তৈরি করতাম, তবে তার নাম দিতাম 'নিরাশকারী পান্ডা'। চোখে গোল মুখোশ পড়ত, আর জামায় বড় অক্ষরে লেখা থাকত ইংরেজি 'টি' । কিন্তু তার বিশাল ফোলা পেটের তুলনায় তা হাস্যকর রকমের ছোট দেখাত। তার কাজ হতো, নির্মম সত্য কথা বলা। মানুষ যা শুনতে চায় না,কিন্তু শোনা উচিত। এটাই হতো তার সুপার পাওয়ার।

বাইবেল বিক্রেতাদের মতো সে-ও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ত, আর নিজের কাজ করত। যেমন, অবশ্যই আপনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সুখী হতে পারবেন। কিন্তু আপনার সন্তানেরা যে আপনাকে ভালোবাসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অথবা, স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নিয়ে মনে প্রশ্ন উদয় হওয়ার অর্থ হলো, আপনি হয়তো তার উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। আবার, আপনি যাকে বন্ধুত্ব বলে দাবি করছেন, তা শুধু মানুষকে প্রভাবিত করার একটা চেষ্টা মাত্র। তারপর সেই বাড়ির মালিককে শুভ কামনা জানিয়ে হেলে দুলে পাশের বাড়ির দিকে এগোবে সে।

অস্বাভাবিক এবং দুঃখদায়ক হলেও দারুণ হতো ব্যাপারটা। কারণ ব্যাপারটা একই সাথে অনুপ্রেরণাদায়কও। জীবনের বড় সত্যগুলো তো তিক্তই হয়, তাই না?

পান্ডা এমন একজন সুপারহিরো হতো, যার সাহায্য আমরা কেউই চাইতাম না। কিন্তু আমাদের সবারই তাকে দরকার হতো। আমাদের দৈন্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত সে, যেন আমরা আরও ভালো থাকতে পারি | অন্ধকারকে চিনিয়ে দিত, যেন আলোর দিকে আমাদের পথচলা থেমে না যায়। সিনেমার শেষে নায়কের মৃত্যু আপনাকে বিচলিত করে। কিন্তু আপনি তা অনেক পছন্দও করেন। কারণ তা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। পান্ডার কথা শোনাটাও একই রকম ব্যাপার হতো।

আরেকটি অপ্রিয় সত্য বলতে চাচ্ছি। আমাদের ভোগান্তির কারণ খুব সাধারণ একটা বিষয়। আবার বিষয়টা আমাদের জন্য উপকারীও। পরিবর্তনের জন্য ভোগান্তিই প্রকৃতি প্রদত্ত অপরিহার্য এক উপাদান। কষ্ট ভোগ না করলে দিন বদলানোর ইচ্ছে জেগে উঠে না। মানবজাতি বিকশিত হয়েছে অতৃপ্তি এবং অনিরাপদবোধ থেকেই। বেঁচে থাকার তাগিদেই তাকে নতুন আবিষ্কার করতে হয়েছে। আমাদের যা আছে তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। শুধুমাত্র অধরা জিনিসই আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে। এই চাহিদার জন্যই মানব জাতি সংগ্রাম করে টিকে আছে। নতুন জায়গা জয় করছে, তৈরি করছে নতুন জিনিস। দুঃখ-দুর্দশা মানবজাতির বিকাশে কোন ক্ষত নয়। বরং এটাই আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

যেকোনো ধরণের যন্ত্রণাই আমাদের শরীরকে নাড়া দেয়। ধরুন, চলার পথে আপনার পায়ের আঙুলে গুঁতো খেলেন। আমার মতো হলে সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠবেন। আর চিৎকার করে চার অক্ষরের বিশেষ একটি শব্দ বলে উঠবেন। পোপ ফ্রান্সিস অবশ্য তা শুনে হতাশ হতে পারেন। আপনি আপনার ব্যথার জন্য প্রাণহীন কোন কিছুকেও দায়ী করতে পারেন।

অথবা আরও একধাপ এগিয়ে আপনার পুরো ঘরের নকশাকেও দায়ী করতে পারেন। এই আঘাত পাওয়াটাকে আপনি, আমি এবং পোপ ফ্রান্সিস সবাই ঘৃণা করি। কিন্তু তারও প্রয়োজনীয়তা আছে। শারীরিক ব্যথা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রেরই অংশ, নিজেদেরকে বুঝতে সাহায্য করে। আমরা কোথায় যেতে পারব বা কোন জিনিস ধরতে পারব না, সে বিষয়ে সতর্ক করে দেয়। তারপরেও অনেক সময় আমরা অসতর্ক হয়ে পড়ি। আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র তখন আমাদের শাস্তি দেয়। যেন আমরা আরও সতর্ক হই এবং পুনরায় একই ভুল না করি ।

আমরা আঘাতকে যতই ঘৃণা করি না কেন, তা আমাদের জন্য খুবই দরকারি। তা ভালো ও মন্দের পার্থক্য তুলে ধরে, এর কারণেই আমরা যৌবনে শিখতে পারি কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। আঘাত আমাদের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করায়। এই আঘাত পাওয়ার ভয়েই আমরা গরম চুলা

থেকে দূরে থাকি । বৈদ্যুতিক সংযোগে ধাতব জিনিস দিয়ে গুঁতোগুতি করি না। কিন্তু তাই বলে সব সময় যন্ত্রণা থেকে দূরে সরে থাকা ঠিক না।

আঘাত কেবলমাত্র শারীরিক হয় তা নয়। স্টার ওয়ার্সের প্রথম প্রিকুয়েল যারা দেখেছেন, তারা বুঝবেন। আঘাত মানসিকও হতে পারে। এমনকি গবেষণায়। এসেছে, আমাদের মস্তিষ্ক শারীরিক এবং মানসিক আঘাতের মাঝে তেমন পার্থক্য করে না। আমার প্রথম প্রেমিকা যখন আমাকে ধোঁকা দেয়, আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার হৃদয়কে কোন বরফশীতল ছুরি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে। তোআমার এই অনুভূতি তাই খুব একটা অযৌক্তিক নয়।

শারীরিক আঘাতের মতো মানসিক আঘাতও সবসময় অপ্রয়োজনীয় নয়। হাঁটতে গিয়ে পায়ে গুঁতো খেলে আমরা যেমন সতর্ক হয়ে হাঁটতে শিখি, তেমনি মনে দুঃখ পেলেও আমরা ভুল থেকে শিক্ষা পাই। একই ভুল এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

আপনি ঝামেলাহীন একটা জীবনের প্রত্যাশা করতেই পারেন। ঝামেলাবিহীন সুখী জীবন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পৃথিবীতে আপনি তা কখনোই পাবেন না। ঝামেলা থাকবেই। নিরাশকারী পান্ডা এসে উপস্থিত হয়েছে। দুজনে বসে বসেমার্গারিটাগিলছি। আমাকে বলছে-ঝামেলা এমনি এমনি হারিয়ে যায় না, বরং বেড়ে চলে। ওয়ারেন বাফেটের টাকা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। আবার মদ্যপ, গৃহহীন লোকটারও টাকা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। পার্থক্য হলো, বাফেটের ঝামেলাটা একটু সুবিধাজনক।

'জীবনে একের পর এক ঝামেলা আসবেই, মার্ক।এই বলে পান্ডা তার গ্লাসে চুমুক দিল। নিজের ছোট্ট গোলা পিছা তা ঠিক করতে করতে বলল, 'একটি সমস্যার সমাধান আরেকটি ঝামেলার পথ তৈরি করে।

এক মুহূর্ত পর আমি ভাবলাম, এই পান্ডা এলো কোথা থেকে? জুসটাই বা পরিবেশন করল কে?

'ঝামেলাহীন জীবনের প্রত্যাশা করবেন না। কখনোই তা পাবেন না। ঝামেলাগুলো যেন সুবিধাজনক হয়, এই প্রত্যাশাই করুন।" এই বলে সে গ্লাস নামিয়ে রেখে সমব্রেরো হ্যাট মাথায় চাপিয়ে হেলে-দুলে চলে গেল।

সমস্যা সমাধানেই সকল সুখ

ঝামেলা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য জিমে ভর্তি হলেন। এতে করে নতুন করে কিছু ঝামেলা যুক্ত হলো। সকাল সকাল উঠে

জিমে গিয়ে ঘাম ঝরান। তারপর গোসল করে, কাপড় বদলে অফিসে যান। কেননা, পুরো অফিসকে তো আর আপনি দুর্গন্ধময় করে তুলতে পারেন না। ধরুন, আপনার প্রেমিকাকে সময় দিতে পারছেন না। সপ্তাহের বিশেষ রাত ঠিক করলেন ডেট করার জন্য। এতেও নতুন কিছু ঝামেলা যুক্ত হলো। কারণ সে সময়টাকে উপভোগ্য করার জন্য চিন্তা করতে হলো, ডেট করার জন্য ভালো জায়গা খুঁজে বের করতে হলো। আপনাদের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা কমিয়ে আনার ব্যাপারেও চিন্তা করা লাগল ।

ঝামেলার শেষ নেই। তা শুধু রূপ বদলায় অথবা বেড়ে আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করে।

ঝামেলা ঝেড়ে ফেললেই আনন্দ আসে। এখানে মূলকথা হলো, ঝেড়ে ফেলা। ঝামেলা এড়িয়ে চললে অথবা এর অস্তিত্ব স্বীকার না করে লাভ নেই। এতে নিজেকে আরও বিপদে ফেলবেন। ঝামেলা ঝেড়ে ফেলাকে অসম্ভব ভাবলে আপনি আরও হতাশ হবেন। ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়া নয়, আসল রহস্য ঝেড়ে ফেলাতে।

কোন কিছু সমাধান করতে পারলে আনন্দ লাগে। সুখ হলো আপনার কর্মফল৷ এটা মোটেও আশীর্বাদ জাতীয় কিছু নয়। হাফিংটন পোস্টেপড়া কোন জাদুকরী বিদ্যা নয়, কোন গুরুলব্ধ জ্ঞানও নয়। অনেক টাকা আয় করলেই সুখ জাদুর মতো ধরা দেবে না। সুখ কোন ধারণা নয়, আপনার জন্য বিশেষ কোন জায়গায় অপেক্ষাও করছে না।

ঝামেলা জীবনের দৈনন্দিন বিষয়। সুখও তাই। আজকের দিনের সমস্যার সমাধান আগামী দিনের সমস্যার পথ সুগম করবে। আসল সুখ তখনই খুঁজে পাবেন যখন হাসিমুখে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

কোন সময় সমস্যাগুলো সাধারণ- ভালো খাবার খাওয়া, নতুন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। আবার কোন সময় জটিল-মায়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা। ভালো ক্যারিয়ার গড়ে তোলা। সবার সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখে চলা।

আপনার ঝামেলা যা-ই হোক, মূলকথা একটাই৷ ঝামেলাকে ঝেড়ে ফেলে সুখে থাকা। অনেকেই জীবনকে এভাবে সহজ করতে পারেনি। কারণ তারা দুটো জায়গায় সমস্যা করেন।

১. অস্বীকারঃ তারা নিজেদের সমস্যাকে স্বীকার করতে চায় না। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে। ক্ষণিকের জন্য তা স্বস্তিদায়ক হলেও, সত্যিকার অর্থে তা ভালো ফল বয়ে আনে না

২. অসহায় মনোভাবঃ সমস্যা এলেই অনেকে ভাবে, তার সমাধানের বোধহয় কোন পথ নেই। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাধানের অনেক পথ খোলা থাকে । সমস্যার জন্য অন্যদের অথবা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে দায়ী করে। এ ধরণের মনোভাব স্বল্প সময়ের জন্য উপকারী হলেও তা থেকেই ক্রোধ, হতাশা এবং অসহায়ত্বের জন্ম হয়।

অপরকে দায়ী করা সহজ এবং সেটাই নিরাপদ। অপরদিকে সমস্যা সমাধান করার কাজটি কঠিন। অন্যকে দায়ী অথবা নিজের ভুলের ভুলের জন্য সমস্যা অস্বীকার করে আমরা সাময়িকভাবে শান্তি পাই।

মানুষের কাছে শান্তি অনেকভাবেই আসে। মাদকের আশ্রয়ে, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, নতুন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে। সমস্যা সমাধানের থেকে উটকো মনোভাবটাই বেশি দেখা যায়। অনেক গুরুই আপনাকে শেখাবে কীভাবে সমস্যাকে অস্বীকার করতে হয়। কিভাবে নিজেকে ফুরফুরে, সতেজ রাখার চেষ্টা করতে হয়। মনে রাখবেন, একজন সুখী লোকেরও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুখী দাবী করার কোন কারণই নেই।

প্রশান্তি আসক্তিও তৈরি করতে পারে। এভাবে চিন্তা করলেসবকিছুতেই আসক্তি সম্ভব৷ প্রশান্তিকীভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। মনঃকষ্ট দূর করার জন্য আমাদের নিজেদের স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। স্বাভাবিক মাত্রায় হলে ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যত সমস্যা এড়িয়ে যেতে থাকব বা ভুলে থাকার চেষ্টা করব, সমাধানের সময় তত বেশি অসুবিধা হবে।

আবেগকে বেশি মূল্য দেবেন না

আবেগ বিকশিত হবার কারণ একটিই। বেঁচে থাকার তাগিদ এবং প্রজাতির বংশগতির সুরক্ষায়। শুধু এটুকুই। আবেগ শুধু আমাদের করণীয় এবং অকরণীয় সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর বেশি কিছু নয়।

গরম চুলায় হাত লাগাটা যেমন শিক্ষা,তেমনি একাকীত্বও আপনার জন্য শিক্ষা।

একাকীত্ব গ্রাস করতে পারে এমন কাজ এড়িয়ে চলবেন। আবেগ আপনাকে মঙ্গলের দিকে ধাবিত করে।

দেখুন, আপনার মধ্যবয়সের সমস্যা সমাধানে আমি আলোর দিশারী হয়ে আসিনি। আট বছর বয়সে আপনার মদ্যপ পিতা সাইকেল চুরি করে নিয়ে গেছে, তা আর ফেরত পাননি। কিন্তু বিষয়টি অবচেতন মনে বারবার কড়া নাড়ছে।

অন্য কথায়, নেতিবাচক আবেগ কিছু করার জন্য তাগাদা দেয়। আর সুখানুভূতি হলো, সঠিক কাজ করার পুরষ্কার। এভাবে দেখলেজীবন খুব সাধারণ । সুখানুভূতি শুধু উপভোগ করার জন্য। তবে নতুন ঝামেলা এসে হাজির হওয়ার কারণে এই সুখানুভূতিও চলে যায়।

আবেগ আমাদের জীবনের সমীকরণের পুরোটা জুড়ে নয়, তা শুধু একটা অংশ মাত্র। কোন জিনিস ভালো লাগলেই তা ভালো হয়ে যায় না। আবেগ মন্ত্রণার মতো, বিধান নয়। তাইনিজের আবেগকে অতি বিশ্বাস করা যাবে না। আমি মনে করি, আমাদের উচিত সবসময় আবেগকে প্রশ্ন করে চলা।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কারণে অনেকেই নিজেদের আবেগকে দমন করে রাখে। বিশেষ করে নেতিবাচক আবেগ। দুঃখজনক বিষয় হলো,এর ফলে সমস্যা সমাধানের পথও বন্ধ হয়ে যায়। এই মানুষগুলোর ঝামেলা ঝেড়ে ফেলতে অনেক বেগ পেতে হয়। আর ঝেড়ে ফেলতে পারলে সুখও ধরা দেয় না। মনে রাখবেন, সমস্যারও উদ্দেশ্য আছে।

অনেকে আবার সবকিছুতেই আবেগকে সামনে নিয়ে আসে। যেকোনো কর্মকান্ডকে আবেগের নামে চালিয়ে দেয়। সরি, তোমার গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে ফেলেছি? আমার মাথা ঠিক ছিল না। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। অথবা স্কুল ছেড়ে দিয়ে আলাস্কা চলে এসেছি। কারণ,আমার কাছে এটাই সঠিক মনে হয়েছে। যুক্তি উপেক্ষা কওে আবেগতাড়িত সিদ্ধান্তগুলো খুব একটা সুবিধার হয়না। কে পুরো জীবনে আবেগের উপর নির্ভও কওে সিদ্ধান্ত নেয় জানেন? তিন বছরের শিশু আর কুকুর। তারা আরও একটা জিনিস করে। কার্পেটের উপরই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়।

আবেগের উপর অগাধ আস্থা রাখলে ব্যর্থ হতে হয়। কারণ আবেগ চিরস্থায়ী নয়। আজকে যা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, আগামীকাল তা না-ও দিতে পারে। কারণ আমরা চিরকালই আরও কিছু চেয়ে এসেছি। নতুনবাড়ি, নতুন প্রেম, আরেকটি সন্তান। এসব কিছু সত্ত্বেও আমরা আবারও সেই আগের জায়গায় ফিরে যাই। যার নাম- নতুন চাহিদা।

সাইকোলজিস্টরা একে মাঝে মধ্যে আনন্দদায়ক ট্রেডমিল নামে অভিহিত করে থাকেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা আমাদের জীবন বদলানোর জন্য এত বেশি ব্যস্ত থাকি যে, অন্য কিছুতে মনোযোগ দেয়ার সময়ই পাই না ।

এ কারণেই আমাদের সমস্যাগুলো পুনরায় ফিরে আসে। আপনি যাকে বিয়ে করবেন, তার সাথে ঝগড়া হবেই। যে বাড়িটি কিনছেন, তারই তো মেরামত করবেন। আপনার স্বপ্নের কাজটাই আপনার মস্তিষ্কে চাপ তৈরি করে। কোন কিছু

অর্জন করতে হলে, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। খেয়ালখুশি মতো আচরণ করলে অবশ্যই তার মূল্য দিতে হবে।

বিষয়টি হজম করা কঠিন। আমরা সর্বোচ্চ সুখ অর্জন করতে চাই।। সমস্যাগুলো চিরতরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই। সুখের সাগরে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে চাই।

কিন্তু কখনোই তা সম্ভব নয়।

নিজের লড়াইটা বেছে নিন

জীবন থেকে আপনি কী চান? সুখ, ভালো পরিবার এবং পছন্দের চাকরি? এটা খুবই সাধারণ প্রত্যাশা বটে,তবে অর্থবহ কিছু নয়।

প্রত্যেকেই ঝামেলাহীন সুখী জীবন প্রত্যাশা করে। প্রেমে পড়তে চায়, সুদর্শন হতে চায়, প্রচুর টাকা, জনপ্রিয়তা আর সম্মান চায়। প্রত্যেকেই তা চায়। কারণ চাওয়াটা সহজ।

খুব ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করতে, আপনি জীবনে কোন সমস্যাটা চান? কতটুকু কষ্ট করতে তৈরি আছেন? কারণ জীবন নদীর গতিপ্রবাহের উপর নির্ভর করে।

দেখা যায়, অফিসে সবাই উঁচু পদটা চায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা কাজ করতে চায় না। প্রত্যেকেই চায় তাদের সম্পর্ক ঝামেলাহীন ভাবে চলুক। কিন্তু কড়া কথা, নীরবতা ও মনোমালিন্যকে মেনে নিতে রাজি কয়জন? তাই তারা বছরের পর বছর বসে ভাবে, যদি এমন হতো! এরপর প্রশ্নটা আর কী বাকি আছে?;তে পরিণত হয়।

সুখ পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয়। সমস্যা সমাধান করে পেতে হয়। মাটি ফুঁড়ে গাছ উঠে আসার মতো আপনার জীবনে আনন্দ আসবে না। আপনি দুশ্চিন্তায় থাকতে পারেন অথবা একাকীত্বে ভুগতে পারেন অথবা বাজে একজন বস আপনার সময়গুলো যন্ত্রণাময় করে তুলতে পারে। আপনি এই সমস্যাগুলো এড়িয়ে গেলে মুক্তি পাবেন না। সমস্যাগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রত্যেকে সুন্দর দেহ চায়। কিন্তু তার জন্য আপনাকে জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরাতে হবে, হিসেব করে খেতে হবে।

নতুন ব্যবসা চালু করতে গেলে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হয় । সফল উদ্যোক্তা হতে হলে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিতেই জলে। আর সাথে অমানুষিক পরিশ্রম তো আছেই।

আপনি কী করতে পছন্দ করেন?এর উপরে আপনার সাফল্য নির্ভর করে না। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, ;আপনি কতটুকু কষ্ট করতে প্রস্তুত? সুখের পথে সল সময় কাঁটা বিছানো থাকে। তাই কতটুকু কষ্ট করতে রাজি আছেন, তা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

আপনি ঝামেলাহীন জীবন পাবেন না। আপনার চলার পথ সবসময় মসৃণ হবে না। সুখ প্রশ্নটি সহজ। কিন্তু উত্তরটি আমাদের প্রায় সবার কাছেই প্রায় একইরকম কঠিন।

মূল প্রশ্ন হলো, আপনি কতটুকু কষ্ট করতে প্রস্তুত?এই কঠিন প্রেশ্নটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের মাধ্যমেই আপনি কিছু অর্জন করতে পারেন। এই প্রশ্নটাই আপনার জীবনের লক্ষ্য বদলে দিতে পারে। অন্যেও সাথে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

কৈশোরে আমি মিউজিশিয়ান, আরও ভালোভাবে বললে রকস্টার হতে চাইতাম। গিটারের কাজ বেশি আছে এমন কোন গান শুনলেই হলো। নিজেকে স্টেজে ওই গান বাজানোর কল্পনা করতাম। আমার বাজনায় দর্শকিরা উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছে, এই দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। আমার কাছে উন্মত্ত দর্শকের সামনে গিটার বাজানো নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন ছিল কবে আমি এভাবে বাজাব। সব পরিকল্পনা করা ছিল আমার। আদাজল খেয়ে নামার আগে নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম। প্রথমে আমার স্কুল শেষ করা লাগবে, তারপর টাকা জমিয়ে আনুষাঙ্গিক জিনিস কেনা লাগবে। তারপর প্র্যাকটিসের জন্য সময় বের করতে হবে। তারপর চেনাজানা মানুষকে ধরে প্রথম প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে। এরপর... এরপরে কিছুই হলো না।

জীবনের অর্ধেক সময় আমি এই দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন আলোর মুখ দেখেনি। কেন, তা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। কারণ, আমি আসলে তা চাইই-নি।

আমি আসলে ফলাফলের দিকেই মনোযোগী ছিলাম। স্টেজে উঠে হৃদয় নিংড়ে গিটার বাজাচ্ছি আর দর্শক উন্মত্ত হয়ে উঠছে, এই চিন্তাটার প্রতি আমি মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই পর্যায়ে যেতে হলেআমাকে যা করতে হতো, সেই ধ্বতিগুলোর প্রতি আমার নিবেদন ছিল না। আমি আসলে তেমন কোন চেষ্টাই করিনি। সময়মতো৷ সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন দল করে প্র্যাকটিস করা৷

আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার জন্য তা পর্বতারোহণের মতোই বিষয় ছিল। অনেকেই বলবে আমি নিজেই আমার স্বপ্ন পূরণ করিনি। হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমি শুধু চূড়াটাই পেতে চেয়েছিলাম, পাহাড় বাইতে রাজি ছিলাম না।

অনেকেই বলবে আমি নিজেই আমার স্বপ্ন পূরণ করিনি। হাল ছেড়ে দিয়েছি অথবা, সমাজের চাপে নিজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি ।

কিন্তু এসব ব্যাখ্যা বাস্তবতা বিমুখ। সত্যি হচ্ছে, একসময় চাইলেও পে ভেবে দেখলাম, আমি তা মনেপ্রাণে চাইনি। কথা এখানেই শেষ।

আমি কষ্ট ছাড়াই পুরষ্কার চেয়েছি। প্রক্রিয়ার বাইরে থেকেই ফল চেয়েছি। যুদ্ধে না জড়িয়েই জয়লাভ করতে চেয়েছি।

জীবন তো আর এভাবে চলে না।

আপনি কী নিয়ে কষ্ট করতে রাজি আছেন, তাই আপনাকে গড়ে তুলবে। সুঠাম শরীরবানাতে চাইলেজিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে হবে। সপ্তাহান্তেও যে কাজ করতে প্রস্তুত এবং কর্পোরেট রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করে, সে-ই তো এগিয়ে যাবে। শিল্পী হওয়ার জন্য যে না খেয়ে দিন কাটায় দেখা যায়, সেই একসময় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটা শুধু ইচ্ছেশক্তির ব্যাপার নয়।;কষ্ট বিনা সুখ লাভ হয় না ধরণের উপদেশ নয়। এটি জীবনের মূলকথাগুলোর একটি, আমাদের পরিশ্রমই আমাদের ফলাফল নির্ধারণ করে। পুরানো সমস্যাই আমাদের সুখ এবং নতুন সমস্যার জনক।

ব্যাপারটা অনন্ত এক সিঁড়ি বেয়ে চলার মতোই। কোন কারণে আপনি যদি সিড়ি বেয়ে ওঠা থামাতে চান, তাহলে আপনি হয়তোমূল বিষয়টি ধরতে পারছেন না। সিঁড়ি বেয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।

অধ্যায় তিন

আপনি বিশেষ কেউ নন

আমার পরিচিত একজনের কথা বলছি, মনে করুন, ওর নাম জিমি জিমি সবসময়ই নিত্যনতুন ব্যবসা চালু করত। আজ হয়তো আপনাকে বলছে, ও কোন ফার্মের পরামর্শক হিসেবে আছে, কাল বলবে অসাধারণ একটা মেডিকেল অ্যাপ বানিয়েছে। তার জন্য ভালো একটা বিনিয়োগকারী খুঁজছে। অথবাকোন চ্যারিটিতে বক্তা হিসেবে কাজ করেকিংবা নতুন ধরণের কোন গ্যাস পাম্প দিতে চাচ্ছে যা তাকে বিলিওনিয়ারে পরিণত করবে। সবসময় নতুন কিছুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় ও। আপনি যদি ওকে কথা বলার সুযোগ দিলেই হলো!আপনাকে ও বলতে শুরু করবে,কীভাবে তার নতুন কাজ পৃথিবীতে যুগান্তকারী ফল বয়ে আনবে। তার আগের পরিকল্পনাগুলোও কত ভালো ছিল, বলবে সেটাও।

জিমি সবসময়ই ইতিবাচক ছিল। নিজেকে কিছু করার তাগাদা দিত। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করত।

সমস্যা হলো, জিমি ছিলখুব অলস প্রকৃতির । মুখে কথার ফুলঝুরি থাকলেও কাজে নেই। নেশাপাতি করে আর বারে টাকা উড়িয়েই দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করত। জোকের মতো পরিবারের কষ্টার্জিত টাকা শুষে নিয়েছে সে। শহরের অন্য সবার মতো ভবিষ্যতের আশায় ভুল পরিকল্পনায় টাকা খাটিয়েছে। কিছু কাজের চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। যার ফলে কোন ব্যবসাতেই সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

তবুও ও কয়েক বছর এভাবেই কাটিয়েছে। প্রেমিকার থেকে, এমনকি দুরসম্পর্কের আত্মীয়রাও ওর ধারের হাত থেকে বাদ যায়নি। সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, এভাবে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত জিমি। তার আত্মবিশ্বাস ছিল অতিমাত্রায় চড়া। যারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, তাদের সম্পর্কে ও দুঃখ মূল 1. করত। ওর ভাষায়,তারা মস্ত বড় সুযোগ হাতছাড়া করছে। তার ব্যবসাকে কেউ ফালতু বললে সে তাদেরকে অনভিজ্ঞ খেতাব দিত। তার আলসেমি দেখিয়ে দিলে হয়ে যেত হিংসুটে, ঈর্ষান্বিত।

জিমি কিছু টাকা আয় করেছিল, তবে তা ভালো পথে নয়। অন্যের ব্যবসা পরিকল্পনা নিজের নামে চালিয়ে, অথবা কাউকে অংশীদার করার কথা বলে টাকা

নিয়ে আয় করেছিল সে। এমনকি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে ও টাকা নিয়েছিল ও (আমি কখনোই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি।)

আরেকটা বাজে ব্যাপার ছিল, জিমি নিজের আজগুবী চিন্তাধারায় বিশ্বাস করত। এবং নিজের বিভ্রান্তি ছিল রীতিমতো দুর্ভেদ্য।১৯৬০ সালের দিকে ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে নিজের উপর আস্থা বাড়ানোর ব্যাপারটা মনোবিজ্ঞানে বেশ গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়।গবেষণায় দেখা যায়, যারা নিজেকে ভালাভাবে মূল্যায়ন করে, তারা অন্যদের থেকে ভালো কাজ করছে। সমস্যাও কম তৈরি করছে। অনেক গবেষক এবং নীতিনির্ধারক সমাজের সমস্যা সমাধানে একে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, এতে করে সমাজে অপরাধ কমে যাবে, লেখাপড়া ভালো হবে। কাজ বেড়ে যাবে। ফলস্বরূপ, ১৯৭০ সালের দিকে থেরাপিস্ট, রাজনীতিবিদ, শিক্ষকদের মাধ্যমে অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করা হলো। বেশি নম্বর দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের খুশি রাখা হলো। অতি মামুলি কর্মকাণ্ডেও পুরস্কার দেয়া হলো। বাড়িতে বাচ্চাদের অর্থহীন কাজ দেয়া হলো। যেমন-কেন তারা অসাধারণ, অথবা, নিজেদের সম্পর্কে ৫টা ভালো দিক লিখে আনতে বলা হলো।যাজকআরপুরোহিতরা তাদের জনগণকে বোঝাত, তারা প্রত্যেকেই স্রষ্টার কাছে প্রিয়, এবং তাদের অবস্থান আরও ভালো করার জন্য কাজ করা উচিত। অনুপ্রেরণামূলক আর ব্যবসায়িক সেমিনারগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল। সেই পুরানো মন্ত্র জপতে লাগল সবাই, প্রত্যেকেইঅসাধারণ এবং সফল হতে পারে।

কিন্তু এক প্রজন্ম পরেই দেখা গেল, সবাই আসলে অসাধারণ নয়। যথার্থ কারণ ছাড়া নিজেকে অসাধারণ ভাবাটা অর্থহীন। সফল হওয়ার জন্য দুঃখ, দুর্দশা এবং ব্যর্থতা প্রয়োজন। সবাইকে অসাধারণ বলে অনুপ্রাণিত করলেই ঘরে ঘরে বিল গেটস এবং মার্টিন লুথার কিং জন্ম নেবে না। বরং জিমির মতো মানুষ তৈরি হবে।

অতি আত্মবিশ্বাসী উদ্যোক্তা জিমি। যার কোন বিপণন ক্ষমতা ছিল না। নিজেকে শুধু অনুপ্রাণিত রাখতে পারত। ব্যবসায়ের অংশীদারকে;অনভিজ্ঞ; বলে গালাগাল করত। অথচ নিজেই হয়তো কোন রাশিয়ান মডেলকে বাগাতে কোম্পানির ক্রেডিট কার্ড খালি করে ফেলেছে। আর কোন আত্মীয় নেই যে তাকে ধার দিতে পারবে।

এই হচ্ছে জিমি। নিজেকে সবসময় অনেক যোগ্য বলে ভাবত। এতটাই যে, আসল কিছু করার কথাই সে ভুলে যেত।

এই আত্মবিশ্বাসী প্রচারণায় সমস্যা হলো, মানুষ নিজেদের নিয়ে খুব বেশি ইতিবাচক। কিন্তুনেতিবাচক দিক নিরূপণের মাধ্যমেই নিজের যথার্থ মূল্যায়ন

হয়। যেমন, ৯৯.৯৯ ভাগ সময় জিমি নিজেকে অসাধারণ ভাবলেও কীলাভ হয়েছে? কিছুই না। বরং তার জীবনটা ধ্বংসের পথে চলেছে। কীভাবে তা সখী এবং সফল হওয়ার মানদন্ড হতে পারে?

জিমি মনে করত, যোগ্য না হলেও ভালো জিনিস তার প্রাপ্য। তার বিশ্বাস ছিল পরিশ্রম ছাড়াই সে ধনী হতে পারবে। কারো জন্য কিছু না করলেও সবাই তাকে বন্ধু ভাববে। কোন ত্যাগ না করেই সে অসাধারণ জীবন ধারণ করতে পারবে।

জিমির মতো মানুষেরা নিজেদেরকে অনেক বেশি যোগ্য ভাবে। এতটাই যে,তারা আসলেই কিছু অর্জন করেছে বলে মনে করে। যদিও তাদের প্রাপ্তির খাতায় শূন্য। ব্যর্থতার পরও নিজেদের সফল উদ্যোক্তা ভাবে। নিজেদের জীবনবিশারদ ভাবে, অন্যকে অর্থের বিনিময়ে জ্ঞান দেয়। অথচ তার বয়স কেবলই পঁচিশ, এবং বাস্তবিক কোন অর্জনও তার নেই।

তারা অতি আত্মবিশ্বাসে ভোগা মানুষ। তাদের এই আত্মবিশ্বাস অল্প সময়ের জন্য অন্যদেরও মুগ্ধ করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের আত্মবিশ্বাস ছোঁয়াচে আকার ধারণ করে, এবং তাদের আশপাশের মানুষদের সাহায্য করে। এতকিছুর পরও বলতে হয়, জিমির সাথে আমার অনেক ভালো সময় কেটেছে। ওর পাশে আপনার নিজেকে অজেয় মনে হবে।

এভাবে চলার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, সবসময় নিজের উপর সন্তুষ্ট থাকা লাগে। এবং এ কারণে তারা বেশিরভাগ সময়ই দিবাস্বপ্ন দেখেই দিন কাটায়। ব্যর্থতার নর্দমায় পড়েও গন্ধ না পাওয়াটা আসলেই অনেক উদ্যমের ব্যাপার।

তারা অনেকটা নার্সিসিস্টের মতো। নিজেদের দৃঢ় করতে আশপাশের প্রায় সবকিছুই তারা ধ্বংস করতে পারে। সবকিছুকেই তাদের মাহাত্ম্যের প্রতি সমর্থন অথবা হুমকি হিসেবে ভাবে। তাদের সাথে ভালো কিছু হলে সেটা তাদের অসাধারণ যোগ্যতার ফসল। আর খারাপ কিছু হলে কেউ হয়তো হিংসে করে তাদের টেনেহিঁচড়ে নামাতে চাইছে। এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য তারা যে কোন কিছু বিশ্বাস করতে পারে। যেকোনো মূল্যে তারা এই মানসিক অবস্থা বজায় রাখে। তাদের কাছের মানুষের প্রতি শারীরিক এবং মানসিক বিকৃত আচরণ করে হলেও।

কিন্তু এটি ভুল কৌশল। আরেক ধরণের ভ্রান্তি। একে সুখ বলা যায় না। শুধু ভালো অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে একজন মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। দুঃখের অভিজ্ঞতাই বড় ভূমিকা রাখে। জিমির মতো মানুষেরা নিজেদেরকে সফল কল্পনা করে ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকে। নিজেকে যা-ই ভাবুক না কেন, সমস্যা মোকাবেলার সাহস তাদের নেই। এ কারণে তাদের সত্ত্বা দুর্বল

খারাপ দিকগুলো স্বীকার করা ছাড়া নজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আমি অপচয় করি, অনেক সময় সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করি। অন্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা দরকার। এভাবে তারা নিজেদেও উন্নতি করতে পারে।কিন্তু যারা নিজেদেও ভুল বুঝতে পারে না, তাদের কোন সুযোগই নেই সেগুলো শোধরানোর। বাস্তবতা হলো, এই সমস্যাগুলো একদিন সামনে উঠে আসবেই। প্রশ্ন হলো, তা কখন এবং কতটা ঝামেলা তৈরি করবে।

সবকিছু ভেঙে পড়ে

সকাল ৯টার বায়োলজি ক্লাস করছি,বারবার সেকেন্ডের কাঁটার দিকে তাকাচ্ছি। শিক্ষকের একঘেয়ে ক্রমোসোম এবং মাইটোসিস লেকচারের সাথে মিল রেখে টিক টিক করে তা ঘুরে যাচ্ছে। অন্য বাচ্চাদের মতো আমিও ক্লাসে বিরক্তি নিয়ে বসেছিলাম।

এমন সময় স্কুলের সহকারী প্রিন্সিপাল মিঃপ্রাইস দরজায় নক করলেন। ক্লাসের মাঝখানে আসায় দুঃখিত। মার্ক, তুমি একটু বাইরে এসো তো। সাথে করে তোমার জিনিসগুলোও নিয়ে এসো।

আমি একটু অবাক হলাম। বাচ্চাদেরকে প্রিন্সিপালের কাছে পাঠানো হতো ঠিকই। কিন্তু প্রিন্সিপালকে কখনো বাচ্চাদের কাছে আসতে হয়নি। আমি সবকিছু গুছিয়ে বেরিয়ে এলাম।

হলওয়ে খালিই ছিল। দুপাশে সারি সারি লকার। মার্ক, তোমার লকারটা দেখাবে?

অবশ্যই। আমি আস্তে আস্তে হলওয়েতে এগোতে লাগলাম।

লকারের সামনে গিয়ে মি. প্রিন্সের কথামতো আমি লকার খুলে দিই। তিনি আমার কোট, জিম ব্যাগ, ব্যাগপ্যাক এবং লকারের ভিতর থেকে সবকিছু নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন,;আমার সাথে চলো। এবার আমার একটু বিব্রত লাগল।

আমি তার পিছু পিছু তার অফিসে গেলাম। আমাকে বসতে বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি, জানালার পর্দা নামিয়ে দিলেন। ঘামে আমার হাত ভিজতে শুরু করল। অস্বস্তিবোধ হচ্ছেআমার।

আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, আমি কী খুঁজছি?

না।

মাদক।

আমি চমকে গেলাম।

মাদক? কী ধরণের মাদক?

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। দেখি তোমার কাছে কী আছে? বলে ছোট পকেটগুলো খুলে দেখলেন। যেখানে সাধারণত কলম, পেন্সিল রাখি।

আমি ঘামতে শুরু করলাম। সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেল। বুঝতে পারলাম,মাথায় রক্ত সঞ্চালনও বেড়ে গেছে। স্কুলে পড়া ১৩ বছরের একটা বাচ্চা স্কুলে মাদক আনার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে। মাথায় খালি দৌড়ে পালাবার চিন্তা ঘুরছে।

কী বলছেন এসব? আমি এগুলো কিছুই জানি না। আমি প্রতিবাদ করলাম। আত্মবিশ্বাসের সাথে বিষয়টি সামলানো দরকার। বুঝতে পারছিনা আমার ভয় পাওয়া উচিত কিনা। মিথ্যেবাদীরা কি ভয় পায়,নাকি আত্মবিশ্বাসী হয়? ওরা যা- ই করুক না কেন, আমি যে তার উল্টোটা করছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আত্মবিশ্বাস কম, সেই সাথে উল্টো কাজ করাটা আমাকে আরও আত্মবিশ্বাসহীন করে দিল। চক্র শুরু হয়ে গেল আবার।

দেখা যাক, কিছু পাই কিনা। বলে তিনি আবারও ব্যাক প্যাকে খোঁজা শুরু করলেন। ওখানে অনেকগুলো পকেট ছিল। প্রতিটি পকেটেই ছোটখাটো জিনিস রয়েছে। রঙিন কলম, পুরাতন নোট, সিডি এবং আরও অনেক কিছু। আমার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে, যেন থমকে গেছে সময়। ঠিক সকাল নয়টার বায়োলজি ক্লাসের মতো। অথচ প্রতি মুহূর্তে আমার আয়ু ফুরিয়ে আসছে। মিঃ প্রাইস, আমি আর আমার ব্যাকপ্যাক এই বদ্ধ ঘরে আটকে আছি।

অনেক সময় নিয়ে তার খোঁজাখুঁজি শেষ হলো,কিন্তু কিছুই পেলেন না। এতে তাকে বেশ আশাহত মনে হলো। ব্যাকপ্যাক উল্টো করে সবকিছু মেঝেতে ফেলে দিলেন। একটু আগে যেমন আমি ঘামছিলাম, এখন তিনি ঘামতে শুরু করেছেন। পার্থক্য হলো আমি ছিলাম আতঙ্কিত, সেখানে তাকে গ্রাস করছে রাগ।

আজকে কিছু আনোনি,না?স্বাভাবিক স্বরেই বললেন তিনি।

না। আমিও সেভাবে উত্তর দিলাম।

তিনি আমার সবকিছু বের করে আলাদা করে দেখলেন, আমার জিমের যন্ত্রপাতির পাশে স্তূপ আকারে রাখতে থাকলেন। আমার কোট এবং ব্যাকপ্যাক তার কোলে পড়ে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন পরিস্থিতিতেতে অন্য বাচ্চাদের মতো আমারও চিতকার করে কাদতে ইচ্ছে হলো।

মিঃ প্রাইস ফ্লোরে পড়ে থাকা জিনিসগুলো তাকিয়ে দেখছেন। নিষিদ্ধ বা অবৈধ কিছুই পেলেন না। মাদক তো দূরের কথা, স্কুল পলিসির বাইরেও কিছু

পেলেন না। বিরক্ত হয়ে তিনি আমার কোট এবং ব্যাকপ্যাকও ফ্লোরে ছুঁড়ে মারলেন। সামনে ঝুঁকে বসে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

মার্ক, আমি তোমাকে শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি। তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তাহলে তা তোমার জন্যই ভালো হবে। আর যদি কোন চালাকি চেষ্টা করো,তার ফল ভালো হবে না।

ভাবটা এমন যে আমি তার কথা মতোই সব স্বীকার করে নেব।

আমাকে সত্যিটা বলে ফেলো!! তুমি কি আজকে স্কুলে কোন মাদক এনেছ?

চিৎকার করে কাদতে ইচ্ছে করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম। করার মাদক নেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বললেন, ঠিক আছে। তুমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে যেতে পারো।

হতাশ চোখে আমার চুপসে যাওয়া ব্যাগের দিকে তাকালেন। এক পা দিয়ে আস্তে করে চাপ দিলেন। এটাই তার শেষ চেষ্টা!! তিনি কখন আমাকে ছাড়বেন আমি উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছি। এই দুঃস্বপ্ন আমি ভুলে যেতে চাই।

কিছু একটায় তার পা ঠেকল। টোকা দিতে দিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এটাকি?

কীসের কথা বলছেন?

এখানে কিছু একটা রয়েছে। বলে তিনি ব্যাগটি আবার হাতে তুলে চাপ দিলেন। ঘরের সবকিছু আমার কাছে ঝাপসা হয়ে এলো, টলতে শুরু করলাম আমি।

ছোটবেলায় আমি অনেক চালাক ছিলাম। মিশুক ছিলাম। সেই সাথে একটু উজবুকও ছিলাম। চুপিসারে যেন বাড়ি থেকে বের হতে পারি, বারো বছর বয়সে ফ্রিজের চুম্বক দিয়ে আমার বাসার সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করেছিলাম। বন্ধুর মায়ের ঘুম নষ্ট না করেই তার গাড়ি নিউট্রাল গিয়ারে দিয়ে রাস্তায় তুলতাম। জানতাম, আমার ইংরেজি শিক্ষক কট্টর খ্রিস্টান ছিলেন। তাই আমি গর্ভপাত নিয়ে লিখতাম। আরেক বন্ধুর মায়ের থেকে সিগারেট চুরি করেছিলাম। পরে সেগুলো স্কুলের সামনে বিক্রি করি

আমি ব্যাগে গোপন একটি পকেট বানিয়ে রেখেছিলাম। ওখানে আমি মারিজুয়ানা লুকিয়ে রাখতাম।

মিঃ প্রাইস ওই পকেটটাই খুঁজে পেয়েছিলেন। এতক্ষণ ধরে আমি মিথ্যে বলে গেছি। মিঃ প্রাইস তার কথা রেখেছিলেন। তিনি আমাকে সহজে ছেড়ে।

দেননি। কয়েক ঘণ্টা পর হ্যান্ডকাফ পরিয়ে আমাকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। আমি ভাবছিলাম, আমার জীবনটা বোধহয় শেষ হয়ে গেল।

এক দিক থেকে, আমি ঠিকই ভাবছিলাম। আমার বাবা-মা আমাকে গৃহবনদী করে রাখেন। বন্ধুদের থেকে আমাকে আলাদা করে রাখা হয়। স্কুল থেকেও বহিষ্কার করে দেয়া হয়। বছরের বাকি সময়টা বাড়িতেই পড়ালেখা করতে হয় আমাকে।

মা আমার চুল ছোট করে কেটে দেন। ম্যারিলিন ম্যানসন এবং মেটালিকার সব টি-শার্ট ছুঁড়ে ফেলে দেন। (১৯৯৮ সালের এক কিশোরের কাছে ঘটনাটা মৃত্যুদণ্ডে ঘোষিত হওয়ার মতোছিল)। বাবা আমাকে জোর করে তার অফিসে নিয়ে যেতেন। সেখানে ঘণ্টার পর ঘন্টা ফাইল গোছাতে হতো। হোমস্কুল শেষ হলে আমাকে একটা ছোট সরকারি খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানেযে আমি একদম খাপ খাওয়াতে পারিনি, তা খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

আমি আমার চলাফেরা সংযত করছিলাম। পরিণত আচরণে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। আর তখনই আমার বাবা-মা আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমি এই কথাগুলো বলে দেখাতে চেয়েছি, আমার কৈশোরটা কীভাবে তছনছ হয়ে গেল। আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, সমাজ এবং পরিবার হারালাম। এসবকিছুই হলো নয় মাসের মধ্যে। কয়েক বছর পর এসব শুনে আমার থেরাপিস্টও দুঃখ প্রকাশ করেন।

আমার পরিবারের সমস্যা ছিল সমস্যা শুলোকেই আড়াল করে রাখা। যেখানে তাদের উচিত ছিল সমস্যাগুলোকে সামনে নিয়ে এসে আলোচনা করা। কিন্তু তা না করে অদৃশ্য একটা দেয়াল তৈরি করে নিতেন তারা। যেন কিছুই ঘটেনি। সবকিছুই স্বাভাবিক আছে। ঘরে আগুন লেগে গেলেও হয়তো তখন বলতেন- কই! কিছুই তো হয়নি। একটু গরম লাগছে এই যা।

বাবা-মার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। বাসার থালাবাসন এখন আর কেউ ভাঙে না। দরজায়ও কেউ জোরে ধাক্কা মারে না। কুৎসিত ভাষায় চিৎকারও করে না কেউ। আমার এবং আমার ভাইয়ের কোন দোষ নেই, এই বলে তারা সন্তুষ্ট করল আমাদের। আমরা কীভাবে থাকব সে বিষয়ে আলোচনা করল তারা। দুজনের কেউই একফোটা চোখের পানি ফেললাম না। বাবা-মা শুধু জানাল, তাদের কেউই অন্যের সাথে প্রতারণা করেনি। বিচ্ছেদের বেদনার মধ্যেও কথাটা কোথায় যেন উষ্ণতা ছড়ায়। তবুও সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল।

বাবা-মা দুজনই ভালো মানুষ। আমি তাদের এসবের জন্য দায়ী করি না (অন্তত এখন আর না)। তাদের দুজনকেই খুব ভালোবাসি। তাদের নিজস্ব গল আছে, নিজস্ব জীবন আছে। অন্য সব বাবা-মার মতোই নিজস্ব সমস্যাও আছে।

আশীর্বাদ হিসেবে কিছু সমস্যা আমাকেও দিয়ে গেছে। আমিও হয়তোবা আমার সন্তানকে দিয়ে যাব।

আমাদের জীবনে এসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। অবচেতন মনে আমরা ভাবি, এসব সমস্যার সমাধান করতে পারব না। এবং এই অপারগতার চিন্তা আমাদের হতাশ এবং অসহায় করে তোলে।

কিন্তু এর পাশাপাশি আরও কিছু ঘটনা ঘটে। আমাদের সমস্যা অনেক জডি মনে হওয়ায় নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করি। এবং কারণে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম প্রত্যাশা করি।

কৈশোরের এই যন্ত্রণা আমাকে খুব তাড়াতাড়ি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত করে। জিমি যেখানে ব্যবসার জগতে ঘোরাঘুরি করেই নিজেকে বিরাট কিছু মনে করছিল, সে সময় আমি ব্যস্ত ছিলাম মেয়েদের সাথে সম্পর্ক নিয়ে কৈশোরের দুঃসহস্মৃতি এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, সবসময়ই কাউকে না কাউকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হতো আমার। মেয়েদের পিছনে এমনভাবে ছুটতাম, যেমনটা কোন মাদকাসক্ত ছোটে মাদকের পিছনে।

বিছানায় আমি পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠলাম। এবং দশকের বড় একটা সময় কাটিয়ে দিলাম এরকম অসুস্থ ও ফালতু কিছু সম্পর্কে।

তবে আমি শুধু সঙ্গমের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম না। সবাই আমাকে বিশেষভাবে চাইছে, ভালোবাসছে এ ব্যাপারটাই আমি বেশি উপভোগ করতাম। অনেকদিন পর নিজেকে কোন কিছুর যোগ্য মনে হেলা, ধীরে ধীরে নিজেকে বেশি প্রাধান্য দেয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হলো। মানুষকে ধোঁকা দেয়া, বিশ্বাস নষ্ট করা, অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া, যা খুশি করতে পারি বলে ভাবতে লাগলাম।

এ সময়টা আমি অনেক উপভোগ করেছি। অনেক সুন্দরী নারীদের সান্নিধ্য পেয়েছি বটে, কিন্তু একই সাথে আমার উপর দিয়ে ঝড়ও বয়ে গেছে। প্রায়ই বেকার হয়ে বসে থাকতাম। মায়ের সাথে অথবা বন্ধুর সোফায় ঘুমাতে হতো। অতিরিক্তমদ্যপান করতাম। আর কোন মেয়েকে ভালো লাগলে বাকিসব এমনিতেই হয়ে যেত।

সমস্যা যত গভীর হয়, আমরা তত অসহায় হয়ে পড়ি। আর যত বেশি অসহায় হই, ততই আমাদের চিন্তাধারা এই দুইয়ের যেকোনো একভাবে কাজ শুরু করে।

১. আমি সবার থেকে সেরা। তাই আমার বিশেষ সুবিধা পাওয়া উচিত।

২. অন্য সবাই আমার থেকে সেরা। তাই আমার বিশেষ সুবিধা পাওয়া উচিত।

বাইরে যাই দেখাই না কেন,অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে স্বার্থপরতা। আসলে বেশিরভাগ মানুষই এই দুইয়ের মাঝে ঘুর পাক খায়। হয় ভাবে তারা সবার উর্ধ্বে আর নয়তে সিবাই তার উর্ধ্ব। অবশ্য এই ধারণ নির্ভও কওে তার দিন কেমন যাচ্ছে। ভালো দিন গেলে ভালো, আর নয়তো দোষ চাপাতে হবে অন্যেও উপরে।

বেশির ভাগ মানুষই জিমির মতো ব্যক্তিত্বকে গোঁয়ার নার্সিসিস্ট হিসেবে ধরে নেয়। কারণ জিমি নিজেই নিজের বড়াই করতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু যারা নিজেকে ব্যর্থ, নিকৃষ্ট মনে করে হতাশায় ডুবে থাকে তাদেরকে নিয়ে কেউই মাথা ঘামাতে আসে না।

নিজেকে পরিস্থিতির অসহায় শিকার মনে করাটা এক প্রকারের স্বার্থপরতা বৈকি। নিজের সমস্যাকেই সবচেয়ে বড় মনে করা আর ভাবা যে অন্য কারো জীবনে কোন সমস্যাই নেই- এমনটা চিন্তা করাটাই ভ্রান্তি।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ব্যক্তিগত সমস্যা বলে আদতে কিছুই নেই। যদি আপনার জীবনে কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার মানে হলো আরো হাজারো মানুষের একই সমস্যা হয়েছে, হয়েছিল আর ভবিষ্যতেও হবে। অবশ্য তার মানে এই না যে সমস্যার গুরুত্ব কমে গেলো বা আঘাত কমে গেলো। এর মানে এ-ও না যে আপনি পরিস্থিতির শিকার নন।

এর মানে হচ্ছে আপনি বিশেষ কেউ নন ।

আপনি আপনার সমস্যা গুলোকে তার তীব্রতা বা কষ্টের মাত্রানুযায়ী গুরুত্ব দেন না। সমস্যা সমাধানের চাবি কাঠি এটাই। সমস্যার গুরুত্ব নির্ধারন করা।

ইদানিং দেখা যায় তরুণরা এই ভুলটা বেশি করছে। বেশ কয়েকজন প্রফেসর আর শিক্ষাবিদদের মত অনুযায়ী বলা যায় যে তরুণদের মাঝে স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, আবেগ বেশি কাজ করছে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে। কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগছে বলে পাঠ্যক্রম থেকে বই বাদ দেয়া হচ্ছে- এমনটা অহরহই হচ্ছে এখন। বক্তা আর প্রফেসরদের নিষিদ্ধ করা হচ্ছে মতপার্থক্যের কারণে। স্কুল কাউন্সেলরদের হিসেব অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা রুমমেটের সাথে ঝগড়া, রেজাল্ট খারাপ হওয়ার মতো স্বাভাবিক ঘটনাতেও ভেঙে পড়ছে।

আমরা বর্তমানে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারছি কত সহজে। এতে করে বেড়ে গেছে নিজেদের অধিকার তৈরি করে নেবার মাত্রাও। প্রযুক্তির কল্যাণে আমাদের নিরাপত্তাহীনতা পাখা মেলেছে। আমরা স্বাধীনতা পাচ্ছি নিজেদের মতামত প্রকাশ করার কিন্তু একই সাথে চাইছি না অন্যদের মত মেনে নিতে। কিংবা যাদের কথা পছন্দ হচ্ছে না তাদেরকে এড়াতে চাইছি। অন্যদেরও

যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে সেটা মেনে নিতে পারছি না। জীবন যাপন। যতই সহজ হচ্ছে, ততই চাইছি আরো কমুক ঝামেলা, যেন আমাদের অধিকারই যতই সহজ হচ্ছে, ততই চাইছি আরো কমুক ঝামেলা, যেন আমাদের অধিনক হচ্ছে সমস্যাবিহীন জীবন পাবার ।

ইন্টারনেট আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপকারিতা বলে শেষ যাবে না। একদিক দিয়ে ভাবলে, বর্তমান যুগই ইতিহাসের সেরা জীবনধারণের জন্য। কিন্তু এই প্রযুক্তির বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয় আছে। হয়তো এই প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্যই আমরা মনে করি আমাদে অধিকার অন্যজনের চাইতে একটু বেশি।

ভিন্নধর্মীতার নিপীড়ন

দৈনন্দিন কাজে বেশিরভাগ মানুষই সাধারণ মানের। কোন একটা বিশেষ কাজে আলাদা হয়েও থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি সাধারণ মানের। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কোন বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জনে আপনাকে প্রচুর সময় এবং শ্রম দিতে হবে। আমাদের সময় এবং সামথ্য দুই-ই সীমাবদ্ধ। তাই,খুব কম লোকই নিজেকে বিশেষ উচ্চতায় তুলে ধরতে পারেন।

অংকের হিসেবে বললে, একজন লোকের পক্ষে সবকিছুতে নিজেকে মেলে ধরা সম্ভব নয়। তুখোড় ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিজীবনে অনেক ভুল করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, অসাধারণ খেলোয়াড়রা বোকাসোকা ধরণের।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সবাই সাধারণ মানের। ক্ষিপ্রতাসম্পন্ন লোকেরাই শুধু প্রচারণা পায়, আমরা প্রত্যেকেই তা জানি। কিন্তু এ বিষয়ে খুব একটা কথা বলি না। এ বিষয়ে কখনোই আলোচনা করিনা।

ইন্টারনেট, গুগল, ফেসবুক এবং ৫০০র বেশি চ্যানেল পাওয়াটা বিশেষ কিছু। প্রযুক্তি আমাদের পুরাতন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্তি দিলেওনতুন মানসিক সমস্যা উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মনোযোগের ব্যাপ্তি খুবং ছোট। এত এত তথ্য সবসময় মনে রাখা অসম্ভব। কেবলমাত্র অসাধারণ ব্যাপারগুলোই মাথায় থাকে। পুরো তথ্যের সমুদ্রের খুব ছোট্ট একটা অংশ সেটা।

আমরা প্রতিদিনই অসাধারণ এর মুখোমুখি হচ্ছি। সেরাদের সেরাদের পেখ পাচ্ছি। খারাপ থেকেও খারাপের পরিচয় পাচ্ছি। শ্রেষ্ঠতম রসিকতাটা ক্রুনাই সবচেয়ে খারাপ খবর জানছি। ভয়াবহ হুমকির মোকাবেলা করছি। অনবরত। দৈনন্দিন জীবনে মানব অভিজ্ঞতার চড়ান্ততম নিদর্শন পাচ্ছি পথে ঘাচে কারণ যোগাযোগ মাধ্যমে সাধারণের ঠাঁই নেই। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে

হলে সেরা কিছু দেখাতে হবে। কারণ এতে পয়সা কামানোর রাস্তাও উন্মুক্ত হয়ে যায়। সত্যি কথা এটাই। আসলে যেখানে মানুষের জীবনে চরম কোন কিছুর দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রাই সাধারণ মাপর, চমক লাগানো কিছু নেই সেখানে। বলতে গেলে মাঝারি মানের অধিকারী সবাই।

এই তথ্যের প্রাচুর্যতা আমাদের বিহবল করে দিয়েছে। আমরা ভাবছি যে ভিন্ন বা অসাধারণ হওয়াটাই এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। আর যেহেতু আমরা সবাই বলতে গেলে মাঝারি মাপের মানুষ, এই নতুন পাওয়া তথ্য জেনে অনিশ্চয়তার ভূগতে থাকি, সংশয় তৈরি হয় নিজেদের সামথ্য নিয়ে। মনে হতে থাকে যে আমি যা পারি সেটা যথেষ্ট না। সুতরাং সেই ঘাটতি কাটিয়ে উঠার জন্য নানা পন্থা কিংবা আসক্তি বেছে নিই। নিজেদের বিশাল কিছু ভাবা শুরু করি আর নয়তো অন্যদের বিশাল কিছু ভেবে নিই- এই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়।

কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে অল্প পরিশ্রমে বিখ্যাত কিছু হবার নেশায়। একজন হয়তো আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, অনাহারের শিকার শিশুদের উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কিংবা কেউ পড়ালেখায় ডুবে যায়। কেউ স্কুলে গুলি চালিয়ে নাম কামাতে চায়। আবার কেউ কেউ অবাধ যৌনতায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

মিলেনিয়ালদের (১৯৮২-২০০৪ সালের মধ্যে জন্ম নেয়া প্রজন্ম) ঘাড়ে দোাাষ পড়ে সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের। এটাও ঠিক যে অন্যসব প্রজন্মের তুলনায় মিলেনিয়ালরাই সবচাইতে মুখর আর চোখে পড়ার মতো। অবশ্য অধিকার ফলানোর প্রবণতা সমাজে সবখানেই আছে। আমার ধারণা এই যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর ভিন্নধর্মীতার সাথে এই প্রবণতার সম্পর্ক আছে।

সমস্যা হচ্ছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আর গণ বিপণনের ফলে মানুষের মাঝে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। নিজের কাছে নিজেরই প্রত্যাশার পারদ আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। এই অতি অসাধারণের মুহুর্মুহু প্রদর্শনীতে নিজেদের ছোট মনেকরছে, নিজের সামর্থ্য্য নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। আরো গুণবান, আরো আত্মনিশ্চয়তার অধিকারী হতে হবে বলে ভাবছে। নয়তো কেউ চোখ তুলে তাকাবেও না। মনোযোগ দেয়া তো দূরের কথা।

আমার যখন বয়স কম ছিল, তখন চারপাশের পপ সংস্কৃতি দেখে আমি ভুল ধারণা করতাম। পৌরুষের সংজ্ঞা সেই সংস্কৃতি আমাকে ভুল শিখিয়েছিল। এমনকি এখনো এই ধারা অব্যাহত আছে। আপনাকে স্মার্ট হতে হবে, পার্টিতে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে হবে, সবার সম্মানের পাত্র হতে হবে, মেয়েদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া চাই। আর সঙ্গমের ক্ষমতা হচ্ছে একজন পুরুষের

সবচেয়ে বড় অর্জন। এর জন্য যে কোন কিছু ত্যাগ করা যায় (এমনকি আত্মসম্মানও)।

যোগাযোগ মাধ্যমের তৈরি করা এই অহেতুক তথ্যপ্রচার আমাদের অনিশ্চয়তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আঘাত করছে আবেগে। কারণ টিভি-পত্রিকায় প্রচার করা অবাস্তব মানদন্ডকে সঠিক মনে করি আমরা। কিন্তু সেসব মানদ্ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হই। এর ফলে তৈরি হয় অসংখ্য সমস্যার। যার নেই কোন সমাধান। এতে করে নিজেদের মনে হতে থাকে হেরে যাওয়া এক মানুষ। কারণ গুগলে খুঁজলেই হাজার হাজার মানুষের দেখা পাওয়া যাবে যাদের আপনার-আমার মতো সমস্যা নেই।

প্রযুক্তি আমাদের পুরাতন অর্থনৈতিক সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিলেও নিয়ে এসেছে মানসিক সমস্যা। ইন্টারনেট কেবল তথ্যকে উন্মুক্তই করে দেয়নি, তৈরি করে দিয়েছে অনিশ্চয়তা, সন্দেহ আর হীনমন্যতায় ভোগার রাস্তাও।

কিন্তু আমি যদি বিশেষ কেউ না-ই হলাম, তাহলে লাভ কী?

আমাদের প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে অসাধারণ হওয়ার। সেলিব্রিটি, বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ সবাই-ই তা-ই বলে। এমনকি অপরাহও তাই বলে (তাহলে নিশ্চয়ই সত্যি ব্যাপারটা)। প্রত্যেকেই নিজেকে অসাধারণ হিসেবে মেলে ধরতে পারে। সবারই খ্যাতি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

এই বক্তব্যটাই আসলে স্ববিরোধী। সবাই যদি অসাধারণ হয়ে যায়, তাহলে কেউই তা অসাধারণ হলো না। বেশিরভাগ লোকই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কোনটা প্রাপ্য এবং কোনটা নয়, সেই প্রশ্ন না করে আমরা জীবনের কাছ থেকে খালি চেয়েই যাই।

গড়পড়তা হয়ে থাকা এখন ব্যর্থতা বলে বিবেচিত হচ্ছে।সমাজে সফলতার মাপকাঠি এখন অসাধারণ হওয়া। এমন সমাজে মধ্যবর্তী হওয়ার থেকে নিচুস্তরে থাকাই ভালো। তাহলে অন্তত অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। অনেকেই এই কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। অন্যদের কাছে নিজেকে সবচেয়ে হতাশাগ্রস্থ, সবচেয়ে শোষিত হিসেবে তুলে ধরছে।

মাঝামাঝি অবস্থায় থাকতে অনেকেইভয় পায়। তারা ভাবে এতে করে তারা কোন উন্নতি করতে পারবে না। তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এ ধরণের চিন্তাভাবনা বিপদজনক। বিশেষ কোন অর্জন থাকাকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবলে বেশিরভাগ মানুষকে (এমনকি নিজেকেও) মুল্য দিতে পারবেন না। এ ধরণের মনোভাব আপনার এবং অন্যদের জন্যও খুব খারাপ।

সত্যিকারের অসাধারণ ব্যক্তিরা শুধু বিশ্বাসের জোরে ভালো অবস্থায় আসে না। তাদের ভাগ্য বদলের ক্রমাগত চেষ্টার ফসল হিসেবে আসে ৷ উল্টো নিজেকে বিশেষ কেউ না ভাবা তাদের এই একাগ্রতাকে বাড়িয়ে তোলে।;আমাদের প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে অসাধারণ হওয়ার কথাগুলো আসলে মনকে ভালো লাগানোর জন্য বলা। আসলে এগুলো ফাকা বুলি ছাড়া আর কিছুই না৷

এসব কথা শুনতে ভালো লাগলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। শরীর ঠিক রাখার জন্য যেরকম শাকসবজি খেতে হয়, তেমনই মনকেও সুস্থ রাখতে চাইলে জীবনের তিক্ত সত্যিগুলোকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন, আপনার কাজকর্ম আসলে খুব বেশি প্রভাব ফেলে নাকিংবা;আপনার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই একঘেয়ে কাটবে, মনে রাখার মতো কিছু না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু এতে দুঃখ পাবার কিছুই নেই। শাকসবজি প্রথম প্রথম খেতে ইচ্ছে করে না। বিস্বাদ লাগে মুখে। সেসব খাওয়াও এড়িয়েও যান আপনি। ঠিক এক্ষেত্রেও আপনি সত্যিকথাগুলোকে এড়িয়ে যাবেন প্রথম দিকে।

কিন্তু একবার সয়ে গেলে, আপনার শরীরকে আরো তাজা মনে হবে, আরো কর্মঠ হয়ে উঠবে। বড় কিছু হয়ে দেখানোর যে চাপ, সেটা ধীরে ধীরে সরে যাবে ঘাড়ের উপর থেকে । সবসময় নিজেকে ছোট মনে করার প্রবণতা, নিজেকে প্রমাণের অহেতুক চেষ্টা থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবেন। আর একবার নিজের সীমাবদ্ধতা আর নীরসতা গ্রহণ করা শিখে নিলে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন।আকাশছোয়া প্রত্যাশা বা পরিণামের ভয় ছাড়াই তা পারবেন।

জীবনের ছোট ছোট ব্যাপারগুলোকে আরো উপভোগ করতে পারবেন। যেমন বন্ধুত্বের আনন্দ, কিছু একটা সৃষ্টির সুখ, কারো প্রয়োজনে পাশে দাড়ানোর গব কিংবা নিছক বই পড়ার আনন্দ, প্রিয়জনের সাথে হাসি-আনন্দে মেতে উঠা ৷

শুনতে একঘেয়ে লাগছে, তাইনা? লাগতেই পারে, ব্যাপারগুলো খুব সাধারণ যেহেতু । হয়তো

অধ্যায় চার

কষ্ট ভোগের মুল্য

১৯৪৪ সালের শেষের দিক। দশক জুড়ে চলা যুদ্ধ শেষের পথে ।জাপান সবকিছুতেই নাকানিচুবানি খাচ্ছে।জাপানের অর্থনীতি ধুঁকছে, দেশটির সেনাবাহিনী অর্ধেক এশিয়া জুরুরি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রশান্ত মহাস অঞ্চলে জয় করা অঞ্চলগুলোও একে একে মার্কিনবাহিনীর কাছে হাতছাড়া যাচ্ছে।পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জাপান।

ডিসেম্বর ২৬, ১৯৪৪ ।সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিরু অনোদাকে ফিলিপার, লুবাং দ্বীপে প্রেরণ করেজাপান ইম্পেরিয়াল আর্মি। মার্কিনবাহিনীকে থামাতে আদেশ দেয়া হয় তাকে, শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বলা হয়। এটি যে একটি আত্মঘাতী মিশন, তা ভালো মতোই জানা ছিল অনোদা আর তার কমান্ডারের।

১৯৪৫ এর ফেব্রুয়ারিতে লুবাং পৌছায় আমেরিকানরা,প্রবলশক্তিতে দীপ দখল করে নেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বেশিরভাগ জাপানি সৈনিক আমন লড়াই করে অথবা আত্মসমর্পন করে । কিন্তু অনোদা তিনজন সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান।সেখান থেকে তারা স্থানীয় জনগণ এবং মার্কিন বাহিনীর বিরুদে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। চোরাগুপ্তা হামলা, রসদ পরিবহনে আক্রমণ করে মার্কিনবাহিনীকে ব্যস্ত রাখেন।

ছয় মাস পরে, আগস্ট মাসে,হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জাপান আত্মসমর্পণ করে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের নাটকীয় নাটকীয় সমাপ্তি হয়।

কিন্তু হাজার হাজার জাপানি সৈন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অনোদার মতো তারাও বিভিন্ন জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। তারা জানতেও পারেনি যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা আগের মতোই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধের পরপূর্ব এশিয়া নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারও কিছু করার চিন্তা করে।

জাপান সরকারের সাথে মিলে যুদ্ধ শেষ হওয়ায় সবাইকে বাড়ি ফিরে যাবায় ইউএস আর্মি। অন্যদের মতো অনোদা এবং তার সঙ্গীরাও এসব লিফলেট

পান। কিন্তু তারা এসব লিফলেটকে জাল ভাবেন, আমেরিকানরা হয়তো গেরিলাদের ফাঁদে ফেলে বের করে আনতে চাইছে বলে মনে করেন। তাই তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

পাঁচ বছর চলে যায়। বেশিরভাগ আমেরিকান সৈন্য তাদের দেশে ফিরে যায়। লুবাঙের জনগণ আগের মতোই কৃষিকাজ এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে।কিন্তু হিরু অনোাাদা এবং তার দল কৃষক এবং জেলেদের উপর হামলা চালিয়ে যায়। তাদের শস্য পুড়িয়ে দেয়, গবাদি পশু নিয়ে যায় । কেউ জঙ্গলের গভীরে গেলে তাকে মেরে ফেলে। ফিলিপাইন সরকার নতুন করে তাদের কাছে বার্তা পাঠায়। যুদ্ধ শেষ। তোমরা হেরে গেছ। বেরিয়ে আসো।

কিন্তু আবারও উপেক্ষা করা হয়।

১৯৫২ সালে জাপান সরকার তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। হারিয়ে যাওয়া সৈন্যদের পরিজনদের ছবি ফেলা হয়, সাথে সম্রাটের লিখিত নোট। অনোদা আবারও এই তথ্যকে জাল বলে উড়িয়ে দেন। তিনি আবারও একে আমেরিকানদের চক্রান্ত ভাবেন।

কয়েক বছর পর স্থানীয় ফিলিপাইন জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তারা অস্ত্র হাতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ১৯৫৯ সালে অনোদার এক সহযোদ্ধা আত্মসমর্পণ করে, আরেকজন নিহত হয়। এর প্রায় দশ বছর পরে, অনোদার আরেক সহযোদ্ধা, কোজুকা স্থানীয় পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। তিনি তখন ধানক্ষেত পুড়িয়ে দিচ্ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ২৫ বছর পরও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন!

জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় লুবাঙের জঙ্গলে কাটিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন অনোদা।

১৯৭২ সালে জাপানে কোজুকার মৃত্যু সংবাদ পৌছালে তা সবাইক আলোড়িত করে তোলে। জাপানি জনগণ ভেবেছিল, বছর কয়েক আগেই শেষ জীবিত জাপানি সৈন্য ঘরে ফিরে এসেছে। মিডিয়া ভাবল, কোজুকা যদি ১৯৭২ পর্যন্ত লুবাঙে থাকতে পারে, তাহলে হয়তো অনোদাকেও পাওয়া যাবে। সে বছরই জাপান এবং ফিলিপাইন সরকার মিলে নতুন করে বিভ্রান্ত এই যোদ্ধাকে অনুসন্ধান শুরু করে।

কিন্তু তারা কিছুই পায় না।

এভাবে মাস চলে যায়। লেফটেন্যান্ট অনোদা জাপানি উপকথায় পরিণত কেউ তার প্রশংসা করে, আবার কেউ তার সমালোচনা করে। আবার অনেকে তাকে রূপকথা বলে উড়িয়ে দেয়, বানোয়াট গল্প ভাবে।

নরিয়ো সুজুকি নামের এক তরুণ এ সময় প্রথম অনোদার কথা জানতে। পারেন। সুজুকি দুঃসাহসী অভিযাত্রিক ছিলেন। যুদ্ধের পর জন্মগ্রহণ করেন, স্কুল শেষ করতে পারেননি। চার বছর ধরে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। পার্কের বেঞ্চে, অন্যের গাড়িতে, থানা হাজতে রাত কাটে তার। খাদ্যের বিনিময়ে ক্ষেতে কাজ করেছেন, রক্ত বিক্রি করেছেন। তার কোন পিছুটান ছিল না, অল্পবিস্তর পাগলও ছিলেন হয়তো।

১৯৭২ সালেআরেকটি অভিযানের দরকার পড়ল সুজুকির। এতদিন প জাপানে এসে তার খাপ খাইয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। তার স্কুল ভালো লাগত না, কোন চাকরি করতে পারতেন না। আবারো পথে নেমে নিজেকে খুঁজতে চাইতেন।

অনোদার উপকথায় সুজুকির সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়ে আসে। সুজুকি ভাবেন, তিনিই পারবেন অনোদাকে খুঁজে বের করতে। জাপান, ফিলিপাইন এবং আমেরিকান সরকারের অনুসন্ধান দল অনোদাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। স্থানীয় পুলিশ ত্রিশ বছর ধরে কিছু করতে পারেনি, হাজার হাজার লিফলেটের কোন জবাব মেলেনি। আর এই কলেজ ত্যাগ করা যুবক অনোদাকে খুঁজে বের করবে!

কোন অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ ছাড়াই তিনি লুবাং যান। একা একা জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেন। তার কৌশল ছিল, চিতকার করে অনোদাকে ডেকে যাওয়া। তাকে জানানো সম্রাট তার জন্য দুশ্চিন্তা করছেন।

তিনি অনোদাকে চার দিনের মধ্যে খুঁজে বের করেন।

সুজুকি অনোদার সাথে জঙ্গলে কিছু সময় কাটান। এক বছরের বেশি সময় ধরে অনোদা নিঃসঙ্গ ছিলেন। অনোদা সুজুকির কাছ থেকে বাইরের খোঁজখবর নিতে থাকেন। জাপানি হওয়ায় তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তাদের মধ্যে একপ্রকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

সুজুকি জানতে চান, কেন অনোদা এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। অনোদা নির্বিকার গলায় জবাব দেন, তার উপর আত্মসমর্পণ না করার আদেশ ছিল তাই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি শুধু তার আদেশ পাণন করে যাচ্ছিলেন। অনোদা জানতে চান, সুজুকির মতো একজন মানুষ কেন তাকে খুঁজতে এসেছেন। সুজুকি জানান, তিনটি জিনিষের খোঁজে জাপান ছেড়ে এসেছেন। লেফটেন্যান্ট অনোদা, পান্ডা ভালুক এবং তুষার মানব।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই দুজন মানুষের পরিচয় হয়েছিল, একটা অলীাক গৌরবের পিছনে ধাওয়া করছিল দুজনেই। যেন দুজনেই জাপানের ডন কুইক্সোট

আর সাঙ্কো পাঞ্জা। কিছু না করেই ফিলিপাইনের এক জঙ্গলে বসে নিজেদেরকে বীর হিসেবে কল্পনা করছিল। অনোদা তার জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় এই যুদ্ধে নষ্ট করেছেন। সুজুকিও তাই। অনোদা এবং পান্ডা ভালুকখুজে পেয়েছিলেন তিনি। কয়েক বছর পর তুষার মানবের সন্ধানে হিমালয় গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে।

মানুষ প্রায়ই অর্থহীন বিষয়ে নিজের জীবনের উজ্জ্বল সময় নষ্ট করে। কোন কারণ ছাড়াই তুচ্ছ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। অনোদা কিভাবে ত্রিশটি বছর ওই দ্বীপে একাকী কাটিয়েছে, তা চিন্তাও করা যায় না। মশা, পোকামাকড়ের মাঝে থেকে দশকের পর দশক নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে গেছে। আবার কেনইব| সুজুকি কোন সঙ্গী বা টাকা-পয়সা ছাড়া তথাকথিত তুষার মানব এর খোজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন?

জীবনের শেষ সময় অনোদা জানায়, তার কোন দুঃখ নেই। লুবাঙে থেকে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিতে পারায় তিনি গর্বিত। তার যৌবনের মূল্যবান সময়গুলো অস্তিত্বহীন সাম্রাজ্যের পিছনে ব্যয় করতে পেরে তিনি ধন্য হয়েছেন। সুজুকি বেঁচে থাকলেও একই কথা বলতেন। তার যা করার কথা তিনি তা-ই করেছেন, সুতরাং তারও কোন দুঃখ নেই।

এই মানুষগুলো নিজের ইচ্ছায় কষ্ট করেছেন। হিরু অনোদা একটা ভগ্ন সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। আর সুজুকি করেছেন তার দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য, তবে তা বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয়েছে কিনা সে প্রশ্নঅবান্তর। তাদের কাছে এই যন্ত্রণার বিশেষ মূল্য রয়েছে। এবং এই মুল্যের কারণেই তারা এসব সহ্য করতে পেরেছেন, হয়তোবা উপভোগও করেছেন।

আমাদের জীবনে দুঃখকষ্ট অনিবার্য এবং আমরা তা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারব না। তাই আমরা কীভাবে দুঃখকে রোধ করতে পারি? এ প্রশ্ন করা বোকামি হবে। প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কেন এবং কীসের জন্য দুঃখ করব?

হিরু অনোদা ১৯৭৪ সালে জাপানে ফিরে আসেন, নিজের দেশে ব্যাপক জনপ্রিয় হন। টক শো, রেডিও সব জায়গায় তাকে ডাকা হয়। রাজনীতিবিদগণ তার সাথে হাত মেলাতে ছুটে আসেন। তিনি একটা বইও বের করেন। সরকার থেকে তাকে অনেক অর্থও দিতে চাওয়া হয়।

কিন্তু নতুন জাপানের ভোগবাদী, পুঁজিবাদী সংস্কৃতি তাকে বিচলিত করে তোলে। তার প্রজন্ম যে আদর্শ এবং ত্যাগের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছিল, তার সবই হারিয়ে গেছে।

অনোদা তার হঠাৎ পাওয়া জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে পুরাতন জাপানের ধ্যান-ধারণাকেজাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ কোন কর্ণপাত করেনি।

অনোদাকে কেউই সময় বদলে দেয়া দার্শনিক ভাবেনি। তিনি ছিলেন যাদুঘর মূল্যবান বস্তুর মতো।

আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অনোদা তার জঙ্গলে থাকা দিনুলে থেকেও বেশি হতাশ হয়ে পড়েন। জঙ্গলে অন্তত তিনি কোন একটা উদ্দে নিয়ে লড়াই করেছেন, যার জন্য তিনি কষ্টগুলো মেনে নিতে পেরেছিলেন। ত একটা মূল্য ছিল। কিন্তু জাপানে ফিরে তার কাছে মনে হয়েছে, তার দেশটা শন হয়ে গিয়েছে। মহিলারা পশ্চিমা পোশাক পড়ছে। তার সংগ্রামের কোন মূল নেই। তিনি এই সত্যটা উপেক্ষা করতে পারেননি। এই উপলব্ধি তাকে বুলেটে থেকেও বেশি জোরে আঘাত করে। তিনি বুঝতে পারেন, ত্রিশটা বছর নষ্ হয়েছে বিনা কারণে।

তাই ১৯৮০ সালে অনোদা ব্রাজিল চলে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি।

পেঁয়াজরূপী আত্ম সচেতনতা

আত্মোপলব্ধি অনেকটা পেঁয়াজের মতো। এর অনেকগুলো স্তর রয়েছে। স্তরগুলো যত সরাতে থাকবেন, আপনার চোখ দিয়ে তত পানি পড়তে থাকবে।

ধরি, আত্মোপলব্ধির প্রথম স্তর হলো আবেগ। এই জিনিসটা করতে আমার ভালো লাগে। এই জিনিসটার কারণে আমার মন খারাপ হয়। এই ব্যাপারটা আমাকে আশাবাদী করে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, বেশিরভাগ লোক আত্মোপলব্ধির গোড়ার জায়গাতেই ভুল করে। আমি জানি, কারণ আমিও তাদের দলে। আমার স্ত্রীর সাথে মাঝেমাঝে খুনসুটি হয়।

স্ত্রীঃ কোন সমস্যা?

আমিঃ নাহ। সব ঠিক আছে।

স্ত্রীঃ কোন একটা সমস্যা আছে। বলে ফেলো।

আমিঃ আমি ঠিক আছি।

স্ত্রীঃ সত্যি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মন খারাপ।

আমিঃ তাই নাকি? (আধ ঘন্টা পর)

আমিঃ.... এই কারণে মন খারাপ ছিল। এমন ভাব করছিলাম, যেন কিছু হয়নি আমার।

আমাদের সবারই আবেগের কিছু জায়গা আছে। বড় হতে হতে এগুলো কীভাবে, কোথায় প্রকাশ করতে হবে, তা শিখে যাই আমরা। যাদের বেড়ে ওঠায় সমস্যা হয়, তাদের প্রকাশেও সমস্যা হয়। এটাকে ফালতু বা অগুরুত্বপূর্ণ ভাবার কিছু নেই।

আত্মোপলব্ধির দ্বিতীয় স্তর হলো, কেন আমরা নির্দিষ্ট কিছু আবেগ বোধ করি।

এই কেনর উত্তর পাওয়াটা সহজ ব্যাপার না। এর জন্য কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছরও লাগতে পারে। অনেকে থেরাপিস্টের কাছে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্নগুলো খুঁজে পায়। আমরা সাফল্য বা ব্যর্থতা বলতে যা বুঝি এই প্রশ্নগুলো তাকেই নির্দেশ করে। তাই এই প্রশ্নগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কেন অল্পতেই রেগে যান? আপনার কোন লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে? আপনি কেন জড়তায় ভুগছেন এবং অনুপ্রেরনাহীন? আপনার যোগ্যতার অভাবে?

আবেগ আমাদের নিমজ্জিত করে রাখে। এই প্রশ্নগুলা করে আমরা তার মূল কারণটা বের করতে পারি। একবার তা বের করতে পারলে, আমরা তার পরিবর্তনও করতে পারি।

আত্মোপলব্ধির আরও একটা স্তর আছে। তা আরও গভীরআর বেদনাদায়ক। এই ধাপটি হলো, আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ। কেন বিশেষ কোন কিছুকে সাফল্য/ব্যর্থতা বলে ভাবি? আমি নিজেকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে চাই? নিজেকে এবং অন্যদের মূল্যায়ন করার মানদন্ডটাই বা কী?

এই ধাপে পৌছানোটা অনেক কঠিন। কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের মূল্যবোধ আমাদের সমস্যার ধরণগুলোকে তৈরি করে। আর সমস্যার ধরণগুলোই আমাদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারন করে।

বেশিরভাগ লোকই এই কেন;র উত্তর সঠিকভাবে খুঁজে পায় না। এবং এই কারণে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধের সম্পর্কেও গভীর ধারণা থাকে না। তারা সততা এবং ভালো বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলতে পারে। কিন্তু একটু পরেই দেখা যাবে, আপনাকে নিয়েই তারা মিথ্যে কথা বলছে। অনেকে একাকী বোধও করতে পারে। কিন্তু তাদের এই একাকীত্বের কারণ কি? তারা অন্যদের দোষারোপ করতে শুরু করবে। সবাই অনেক নীচ, অথবা কেউ তাদের বোঝার মতো যোগ্য নয়। এভাবে তারা সমস্যা সমাধান না করে এড়িয়ে যায়।

অনেকে এই এড়িয়ে যাওয়াটাকেই আত্মসচেতনতা বলে ভাবে। তারা যদি আরও গভীরে গিয়ে নিজেদের মূল্যবোধকে প্রশ্ন করে, তাহলে তারা বুঝতে পারবে, সমস্যা সমাধান না করে তারা আসলে দায়িত্ব এড়াচ্ছে। তারা বুঝতে

পারবে, এভাবে সমস্যা এড়ানো সুখের সৃষ্টি তো আনছেই না, বরং আরও সমস্যার সৃষ্টি করছে।

বেশিরভাগ গুরু এই গভীর ধাপকে উপেক্ষা করেন। তারা অর্থের নেশায় কাতর লোকগুলোকে ধরেন।তারপর তাদের ধনী হওয়ার বিষয়ে পরামর্শ কিন্তু মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান। কেন তাদের ধনা হতে হবে? তাদের সাফল্য/ব্যর্থতার মূল্যায়ন করার মানদন্ডটাই বা কী? তারা যে এখনো বেন্টলি চালাতে পারছে না তার থেকেও তো এই মূল্যায়নটাই তাদের বেশি অসুখী করে তুলছে।

বেশিরভাগ উপদেশ স্বল্প সময়ের জন্য খুশি করার জন্য দেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় ভালো থাকার জন্য যে সমস্যাগুলো সমাধান হওয়া দরকার, তার কিছুই হয় না। মানুষের উপলব্ধি বা আবেগ বদলে যেতে পারে। কিন্তু মূল্যবোধ একই থাকে। এটা আসলে কোন উন্নতি নয়, আরও কিছু অর্জন করার পথ মাত্র।

সৎ থেকে নিজেকে প্রশ্ন করাটা দুরূহ একটা কাজ। সহজ প্রশ্নের উত্তর দেয়াটাই বরং কঠিন। কারণ উত্তরগুলো অস্বস্তিদায়ক হবার সম্ভাবনা থাকে। আমার জীবনে দেখেছি, এসব প্রশ্নেরউত্তর যত অপ্রিয় হয়, সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হয়।

সময় নিয়ে ভাবুন। কোন জিনিসটা আপনাকে বিরক্ত করছে। ভাবুন, কেন তা আপনাকে বিরক্ত করছে। কোন ব্যর্থতা এর কারণ হতে পারে। সেই ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে চিন্তা করুন। কেন আপনার কাছে তা সত্যি মনে হলো। এমনও তো হতে পারে সেটা আসলে কোন ব্যর্থতাই নয়। আপনি ভুলও তো বুঝতে পারেন। নাকি?

আমার কয়েক দিন আগের অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

আমার ভাই ইমেইল এর জবাব না দিলে আমি বিরক্ত হই কেন বিরক্ত হই?কারণ মনে হয়, সে আমাক কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না।

এমন মনে হবার কারণ কী?

কারণ সে আমাকে গুরুত্ব দিলে, দশ সেকেন্ড সময় বের করে আমার সাথে যোগাযোগ রাখত।

কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ না হওয়াটাকে আমি ব্যর্থতা কেন ভাবছি?

কারণ আমরা দুই ভাই। আমাদের মধ্যে ভালো সম্পর্কই থাকার কথা।

এখানে দুটি বিষয় ঘটছে। একটা হচ্ছে, আমি যে মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে আছি, আরেকটা হচ্ছে, সেই মূল্যবোধকে যাচাই করার জন্য মানদন্ড।

আমার মূল্যবোধ হচ্ছে,দুই ভাইয়ের মাঝে ভালা সম্পর্ক থাকা উচিত। আর আমার মানদন্ড হলো,ফোন বা ই-মেইলে যোগাযোগ হওয়াটাকে আমি সফলতা ভাবছি। এইভাবে চিন্তা করলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হতো।

আমরা ব্যাপারটার আরও গভীরে যেতে পারি।

কেন ভাইদের মাঝে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে?

কারণ তারা পরিবারের অংশ। পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভালো সম্পর্ক থাকা উচিত।

কেন এটাই সত্যি মনে হচ্ছে?

কারণ পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভালো সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। আমার ক্ষেত্রে তা ঘটছে না।

আমার মূল্যবোধ হলো, ভাইয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা। কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে মানদন্ডনিয়ে। আমি এর আরেকটা নাম দিয়েছি, ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই। সবাই তাদের পরিবারের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারছে, আমি ছাড়া। তোআমার মাঝেই নিশ্চয় কোন সমস্যা আছে।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমি আমার জীবনে মানদন্ডভুল নির্বাচন করেছি।

কিন্তু সেটাই বা কেন করব? এমন কি কিছু থাকতে পারে, যা আমি বিবেচনা করিনি? থাকতে পারে। হয়তো ভালো সম্পর্ক রাখার জন্য ঘনিষ্ঠ হওয়াটা অত জরুরী না ।আমি আর আমার ভাই কতগুলা মেসেজ চালাচালি করেছি, তার থেকে মানদন্ড হিসেবে পারস্পারিক সম্মান, বিশ্বাসই অনেক উঁচুদরের।

আমার কাছে এই ব্যাপারটাকেই ঠিক মনে হয়,কিন্তু তারপরও আমার কষ্ট হয় ।এটা বদলানোও সম্ভব না। এই জ্ঞান দিয়ে আমার মনও ভালো হবে না। অনেক সময়ভাইদের মাঝে ভালো সম্পর্ক থাকে না। একে অপরকে অনেক ভালোবাসলেও থাকে না। মেনে নিতে কষ্ট হলেও বিষয়টি সত্যি। সমস্যায় কীভাবে পড়েছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সমস্যাটাকে কীভাবে মোকাবেলা করছেন। সমস্যা তো থাকবেই। কিন্তু সব সমস্যার মর্মার্থ এক নয়।

জীবনে সমস্যা থাকবেই, তবে সেই সমস্যার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা নিজেরা ঠিক করে নিতে পারি। কোন মানদণ্ডে সেগুলোকে যাচাই করব, তা পুরোপুরি আমাদের হাতেই।

রক স্টার সমস্যা

১৯৮৩ সালেএকটা ব্যান্ড খুব বাজেভাবে তাদের তরুণ গিটারিস্টকে বের করে দেয়। ব্যান্ডটি কেবল একটা রেকর্ডের চুক্তিকরেছে। দুয়েকদিনের মধ্যেই তাদের প্রথম অ্যালবামের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই কোন আলোচনা কিংবা সতর্ক করা ছাড়াই ওই গিটারিস্টকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। একপ্রকার তাকে ঘুম থেকে তুলেই বাসের টিকেট ধরিয়ে দেয়া হয়।

নিউ ইয়র্ক থেক লস আঞ্জেলস যাওয়ার পথে গিটারিস্ট নিজেকে খালি জিজ্ঞেস করেছে, ;কেন এমন হলো? আমি কী ভুল করেছি? এখন আমি কী করব? রেকর্ডের চুক্তি হঠাৎ করেই হাজির হয় না। বিশেষ করে নবাগত মেটাল ব্যান্ডের জন্য তো আরও নয়। তার জীবনের একমাত্র সুযোগ কি তবে হাতছাড়া হয়ে গেল?

কিন্তু বাস লস আঞ্জেলস পৌছানো মাত্র সে নিজেকে সামলে নেয়। নতুন ব্যান্ড করার শপথ নেয়। নতুন ব্যান্ডকে এমন সফল করতে চায়, যেন তার পুরাতন ব্যান্ড তাদের সিদ্ধান্তের জন্য আফসোস করে। পুরাতন ব্যান্ড সদস্যরা চারিদিকে তার পোস্টার দেখে জ্বলতে থাকবে। যখন ওরা মদ পান করে চুর হয়ে থাকবে,তখন সে স্টেডিয়ামে কনসার্ট মাতাবে।

তো ওই গিটারিস্ট উদয়াস্ত পরিশ্রেম করতে শুরু করল। অনেক সময় নিয়ে সে ভালো ভালো মিউজিশিয়ান খুঁজে বের করল, যারা আগের ব্যান্ড সদস্যদের থেকে অনেক ভালো মিউজিশিয়ান। একের পর এক গান লিখে চলল সে। নিজের ক্রোধ তার উচ্চাভিলাষকে জাগিয়ে তুলল। প্রতিশোধের নেশায় ফুঁসত প্রতিনিয়ত। কয়েক বছরের মধ্যেই তার নতুন ব্যান্ডও রেকর্ডের চুক্তি পায়। এবং প্রথম রেকর্ডটা বেশ ভালোভাবেই নেয় শ্রোতারা।

এই গিটারিস্টের নাম ডেভ মাস্টইন। আর তার প্রতিষ্ঠা করা নতুন কিংবদন্তি ব্যান্ডের নাম মেগাডেথ। দুনিয়া জুড়ে মেগাডেথ ২৫ মিলিয়ন অ্যালবাম বিক্রি করে এবং অসংখ্য ট্যুর দেয়। এখন মাস্টেইনকে হেভি মেটাল জগতে পৃথিবীর অন্যতম মেধাবী এবং প্রভাবশালী মিউজিশিয়ান ধরা হয়।

তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া ব্যান্ডটার নাম আবার মেটালিকা। তারা পথিবীব্যাপী ১৮০ মিলিয়নের অধিক অ্যালবাম বিক্রি করেছে। অনেকের কাছে মেটালিকা সর্বকালের সেরা রক ব্যান্ড।

এ কারণে, ২০০৩ সালে এক সাক্ষাতকারে মাস্টেইন কান্নাভেজা চোখে নিজেকে তখনও ব্যর্থ বলে দাবি করেন। এত অর্জন সত্ত্বেও তিনি সব সময় মেটালিকা থেকে বের করে দেয়া গিটারিস্টই রয়ে গেছেন।

আমরা আসলে বোকা।সুন্দর জামাকাপড় আর উন্নতমানের জুতো পায়ে দিয়ে আমরা নিজেদের অনেক পরিশীলিত ভাবি। কিন্তু আমরা আদতে বোকা ছাড়া কিছুই না। অবচেতন মনেই অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেকে বিচার করি। নিজেদের অন্যের সাথে বিচার করব কিনা, তা মুখ্য নয়। নিজেদের মূল্যায়ন করার মানদন্ডটা আগে ঠিক করতে হবে।

ডেভ মাস্টেইন বুঝে হোক আর না বুঝে হোক, নিজের জন্য একটা মানদন্ড ঠিক করেছিলেন। তা হলো মেটালিকার থেকে বেশি সফল এবং জনপ্রিয় হওয়া। মেটালিকা থেকে বের করে দেওয়ায় তিনি মেটালিকাকে একক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন।

জীবনের দুর্বিষহ একটা ঘটনা থেকে তিনি ইতিবাচকতা বের করে নিয়েছিলেন। মেটালিকার সমান সফলতাকে তিনি তার জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেন। যা বছর দশেক পরে তার হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপুল অর্থ, অসংখ্য ভক্ত এবং সম্মাননা সত্তেও নিজের কাছে তিনি ব্যর্থ।

আমরা ডেভ মাস্টেইনের দিকে তাকিয়ে হাসি,তামাশা করতে পারি। তিনি মিলিয়ন ডলারের মালিক, পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য ভক্ত আছে, পছন্দের কাজকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তারপরও নিজেকে ব্যর্থ ভাবছেন। কারণ তার বিশ বছর আগের বন্ধুরা তার থেকেও বেশি সফলতা পেয়েছে।

তার কারণ আপনার আমার এবং মাস্টেইনের সফলতার একক ভিন্ন। আমাদের সফলতার একক হতে পারে, যে বসকে পছন্দ করি না, তার অধীনে কাজ করব না অথবাঅনেক টাকা উপার্জন করে সন্তানকে ভালো স্কুলে পাঠানো। অকল্পনীয়ভাবে ব্যর্থ ভাবছে। তার একক মেটালিকা থেকে বেশি জনপ্রিয় এবং আর সফলতার এই এককের কারণে মাস্টেইন নিজেকে সফলতা অর্জন এবং এতে তিনি ব্যর্থ।

জাপান সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের মূল্য দিয়ে অনোদা প্রায় ত্রিশ বছর লুবাঙে টিকে ছিল। কিন্তু এই একই আনুগত্য জাপানে ফিরে আসার পর তাকে হতাশ করে তোলে। মেটালিকার থেকে বেশি সফল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, মাস্টেইনকে অবিশ্বাস্য সফলতার এনে দিয়েছে। কিন্তু এই সফলতার পরও ব্যর্থতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাত হলে আপনাকে সাফল্য/ব্যর্থতার মানদন্ডও বদলাতে হবে। অন্য আরেকটি ব্যান্ড থেকে বের করে দেওয়া আরেকজন মিউজিশিয়ানের উদাহরণ দেওয়া যায়। তার গল্পটাও ডেভ মাস্টেইনের সাথে মিলে যায়। ঘটনাটা আরও দুই দশক আগের।

১৯৬২ সাল। ইংল্যান্ডের লিভারপুলের একটা উঠতি ব্যান্ড নিয়ে বেশ শোরগোল শুরু চলছে। ব্যান্ডের সদস্যদের চুলের ছাঁট ছিল অদ্ভুত, নামটাও ছিল অদ্ভুত। কিন্তু তাদের গানগুলা ছিল এককথায় চমৎকার। রেকর্ড কোম্পানি গুলোও ব্যাপারটা লক্ষ্য করে।

মূল গায়ক এবং গীতিকার ছিলেন জন। বাচ্চা চেহারার পল ছিলেন রোমান্টিকবেজ গিটারিস্ট। জর্জ, বিদ্রোহী লিড গিটারিস্ট। আর বাকি থাকল ড্রামার।

সবার মধ্যে তিনিই দেখতে ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। মেয়েরা তার জন্য পাগল হয়ে থাকত। ম্যাগাজিনে তার ছবি ছাপা হতো। দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে পেশাদার ছিলেন। কোন মাদক নিতেন না। প্রমিকার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। স্যুট-টাই পড়া কিছু লোকও ছিল যারা ভাবত, জন অথবা পল নয়, তারই ব্যান্ডের মূল ভূমিকায় থাকা উচিত।

তার নাম পিট বেস্ট। ১৯৬২ সালেতাদের প্রথম রেকর্ড চুক্তির পর, বাকি তিন সদস্য তাদের ম্যানেজার ব্রায়ানএপস্টেইনকে ডেকে তাকে বের করে দিতে বলেন। এপস্টেইনতাদের সিদ্ধান্তে মর্মাহত হন। তিনি পিটকে পছন্দ করতেন। তাই তিনি ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখলেন। আশায় থাকলেন, বাকি তিনজন মত বদলাবেন।

এক মাস পর, রেকর্ডিং এর তিন দিন আগে, এপস্টেইন তার অফিসে বেস্টকে ডেকে পাঠান। সেখানে তিনি বেস্টকে কোন কারণ, ব্যাখ্যা বা সান্ত্বনা ছাড়াই নতুন ব্যান্ড খুঁজতে বললেন। শুধু বললেন, দলের বাকি তিনজন তার সাথে কাজ করতে চাইছে না।

শূন্যস্থান পূরণের জন্য রিঙ্গো স্টারকে ঠিক করা হয়। রিঙ্গো বয়সে তুলনামূলক বড় ছিলেন,নাক ছিল হাস্যকররকমের লম্বা। জর্জেরমতো তিনিও অদ্ভুতভাবে চুল কাটতে রাজি হলেন। অক্টোপাস এবং সাবমেরিন নিয়ে গান লিখ আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিনি। ছাড়পত্র দিলেন বাকি জন, পল এবং তিনজন।

বেস্টকে বের করে দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বিটলস নিয়ে উন্মাদনা শুরু হলো। জন, পল, জর্জ এবং রিঙ্গো পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষগুলোর একজনে পরিণত হলেন।

স্বাভাবিকভাবেই বেস্ট গভীর বিষণ্নতায় আক্রান্ত হলেন। এ অবস্থায় অন্য আর দশটা ইংরেজের মতোই মদ পান করা শুরু করলেন।

ষাটের দশকের বাকি দিনগুলোও পিট বেস্টের জন্য খুব একটা সুবিধের ছিল না। ১৯৬৫ সালে বিটলসের দুইজন সদস্যদের বিরুদ্ধে অপবাদের অভিযোগ আনেন বেস্ট। তার বাকি উদ্যোগগুলোও মুখ থুবড়ে পরে। ১৯৬৮ সালে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

বেস্ট ডেভ মাস্টেইনের মতো একইভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। বিশ্বতারকা হয়ে মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারেননি। কিন্তু অনেক দিক থেকেই বেস্ট ডেভ মাস্টেইনের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। ১৯৯৪ দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেস্ট বলেন, বিটলসের থাকার সময়ের চেয়ে আমি এখন সুখে আছি।

মানে কী?

বেস্ট তার ব্যাখ্যা দেন। বিটলসে থেকে এভাবে বের করে দেওয়ার কারণেই তার স্ত্রীর সাথে প্রথম দেখা হয়। তারপর বিয়ে, তারপর সন্তান। তার গুরুত্ব বদলে যায়। তিনি তার জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করেন। যশ-খ্যাতি অবশ্যই আকর্ষণীয় জিনিস, কিন্তু তার যা আছে সেগুলোকেই বেশি গুরুত্ব দেন। সুন্দর, সুখী পরিবার, গোছানো একটা সংসার, সাধারণ জীবন। এরপরও ড্রাম বাজিয়ে যান। ইউরোপে ট্যুর দেন, ২০০০ সালের দিকে অ্যালবামও বের করেন। তিনি কিছুই হারাননি। আকর্ষণ এবং তোশামোদটাই একটু কম পেয়েছেন। বিনিময়ে যা পেয়েছেন তার কাছে তা অনেক বেশি মূল্যবান।

এই গল্প আমাদের শিক্ষা দেয়, কারো মূল্যবোধ এবং মানদন্ড অন্যের চাইতে ভালো হতে পারে। কেউ হয়তো খুব কঠিন একটা সমস্যাও খুব সহজে সমাধান করে ফেলতে পারে। আবার কেউ খুব সহজ সমস্যা নিয়েও হাবুডুবু খেতে পারে।

নিকৃষ্টতম মূল্যবোধ

কিছু কিছু সাধারণ মূল্যবোধ মানুষের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।আবার এই সমস্যা গুলোর সমাধানও করা যায় না। সেরকম কিছু মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হয়ে নেয়া যাক-

১। আনন্দঃ আনন্দ অনেক আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু জীবনে এর গুরুত অস্বাভাবিক রকমের বেশি দিয়ে ফেলে সবাই। একজন মাদকাসক্তকে জিজে করে দেখুন। আনন্দের নেশায় পরে তার জীবনের কী হাল হয়েছে। ব্যভিচারকারী অল্প কিছু সময়ের শারীরিক আনন্দের ফলে তারপরিবার এবং সন্তান হারিয়ে সুখী হতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মানুষ বাহ্যিক আনন্দেরর জন্য বেশি শ্রম দেয়, তারাই বেশি উদ্বিগ্ন থাকে, মানসিকভাবে অস্থির এবং হতাশায় বেশি ভোগে। আনন্দ উপভোগ করাজীবনে সন্তুষ্টির বাহ্যিক রূপ মাত্র। তাই একে অর্জন এবং হারানো দুটিই সহজ।

তারপরও আমাদের সপ্তাহে চব্বেশ ঘন্টা আনন্দের প্রলোভনদেখানো হয়। আমরা এর পিছনেই ছুটে চলি। এর কারণেই নিজেদের বিষন্ন করে লক্ষ্যচ্যুত হই। আনন্দের প্রয়োজন আছে জীবনে অবশ্যই। কিন্তু আনন্দই সবকিছুর শেষ না।

আনন্দ সুখের কারণ না। এর ফলাফল মাত্র। যদি নিজের জীবনের মূল্যবোধ আর তার মানদন্ড ঠিক রেখে চলতে পারেন, আনন্দ এমনিতেই আসবে।

২। বস্তুগত সাফল্যঃ অনেকেই টাকা পয়সা কিংবা কি ধরনের গাড়ি ব্যবহার করছেন তার উপর নিজের জীবনকে বিচার করে থাকেন। কিংবা তার লনের ঘাসগুলো তার প্রতিবেশীর লনের থেকে বেশি সুন্দর লাগছে কিনা।

এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিক শারীরিক চাহিদাগুলো (খাদ্য, বাসস্থান) পূরণ হবার পরপরই সুখ আর সফলতার মাঝের সম্পর্ক ধীরে ধীরে শূন্যের কোঠায় নামে। ধরা যাক, আপনি কপর্দকহীন অবস্থায় ভারতের কোন এক রাস্তায় দিন কাটাচ্ছেন। পেটে খাবার নেই। আচমকা যদি আপনার আয় বছরে দশ হাজার ডলারে উন্নীত হয়, আপনার সুখের মাত্রা চরমে পৌছাবে। কিন্তু আবার আপনি যদি উন্নয়নশীল কোন দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হন, তবে ওই বাড়তি দশ হাজার ডলার আয়ে আপনার জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আসবে না। আগে যতটা সুখে ছিলেন, ততটাই সুখী থাকবেন। বাড়তি আয়ে বাড়তি সুখ পাবেন না। যার মানে হলো আপনি অফিসে অতিরিক্ত সময় দিচ্ছেন নেহাত খামোখাই। ছুটির দিন গুলোতেও কাজ করছেন বিনা কারণে।

বস্তুগত সাফল্যের আরেকটা ব্যাপার হলো, অন্য সব মূল্যবোধের তুলনায় একে অধিক গুরুত্ব দেয়া। যেটাকে রীতিমতো আশঙ্কাজনক বলা যায়। সততা, অহিংস মনোভাব, সহমর্মিতার মতো সদগুণ গুলোকে পেছনে ঠেলছেন আপনি সাফল্যের নেশায়। যখন মানুষ নিজেকে বিচার করে সমাজে তার পদমর্যাদার

কথা চিন্তা করে, ভুলে যায় তার সেই সদগুণ আর মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা তখন তাকে নেহাত নির্বোধ ছাড়া অন্যকিছু বলা যায় না।

৩। সবসময় সঠিক হওয়াঃ আমাদের মস্তিষ্ককে অকাজ যন্ত্র বলা যায়। আমরা প্রতিনিয়ত ভুল ধারণা করে যাচ্ছি কোন না কোন ব্যাপারে, সঠিক অনুমান করতে ব্যর্থ হচ্ছি, তথ্য মনে রাখতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি। যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি। আমরা ভুল করে যাচ্ছি অহরহ। কারণ মানুষমাত্রই ভুল করে। সুতরাং যদি আপনার জীবনের মানদন্ড হয় সব সময় সঠিক হওয়া তাহলে আপনার জন্য দুঃসময় অপেক্ষা করছে। কথা হচ্ছে, যারা নিজেদের মূল্য নির্ধারন করে সঠিক হওয়ার মাধ্যমে, তারা কখনোই ভুল থেকে শেখে না। নিজেদের চরিত্রের নতুন দিক উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয় তারা। গুটিয়ে রাখে নিজেকে সবসময়, নতুন কিছু শেখা হয়ে উঠে না, জানতেও পারে না অজানাকে।

এর থেকে বরং ধরে নেয়া ভালো আপনি মূখ, কিছুই জানেন না। এতে কুসংস্কার কিংব| তথ্য বিভ্রাটের হাত থেকে বেঁচে যাবেন। এতে লাভ হবে আপনি শিখতে পারবেন, নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

৪। ইতিবাচক মনোভাবঃ আরেক ধরণের মানুষ আছে যারা ইতিবাচকতার মাধ্যমে নিজেদের মূল্যায়ন করে। যেকোনো ব্যাপারেই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। চাকরি চলে গেছে? খুবই ভালো! এখনই সুযোগ নিজের ভালো লাগাকে গুরুত্ব দেয়ার। স্বামী প্রতারণা করেছে? যাক, মানুষ চেনা তো গেল। বাচ্চা ক্যান্সারে মারা গেছে? বাঁচা গল, কলেজের ফি দিতে হবে না।

জীবনে সবসময় ইতিবাচক হয়ে চলা যায় না। সত্যি বলতে, জীবনে ব্যর্থতা থাকবেই। সবার উচিত সেটাকে মেনে নেয়া।

নেতিবাচক আবেগ এড়িয়ে যাওয়া ক্ষতিকর। ভবিষ্যতে এই মনোভাব মানসিক স্বাস্থ্য আর আবেগের বহিঃপ্রকাশের উপর প্রভাব ফেলে। যা মোটেও সুখকর হয় না। সবসময় ইতিবাচকতা ধরে রাখাটা একপ্রকারের এড়িয়ে যাওয়ার মতোই। জীবনের সমস্যা গুলোর কোন সমাধানই না এটা। অবশ্য আপনি যদি নিজের মূল্যবোধ আর তার মানদন্ডকে সঠিক ভাবে বেছে নিতে পারেন, তবে এই আবির্ভূত সমস্যা গুলোই আপনাকে উৎসাহ দেবে সমাধানের পথ খুঁজে নিতে ।

ব্যাপারগুলো আসলে সহজ-খারাপ কিছু ঘটেই, মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেবেই দুর্ঘটনা ঘটবেই। আর এসব ঘটলে আমাদের ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করে।

অসুবিধে নেই। নেতিবাচক আবেগের দরকার আছে। সমাধান না করে এড়িয়ে গেলেই বরং সমস্যা বেড়ে যায়।

নেতিবাচক আবেগের মুখোমুখি হবার কিছু কৌশল আছে। যেমন- ১) মার্জিত উপায়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন ২) নিজের মূল্যবোধ আর আচরণের সাথে খাপ খায়-এমন ভাবে প্রকাশ করতে পারেন। সহজ উদাহরণ হিসেবে নিজের কথাই বলা যাক। আমার অন্যতম মূল্যবোধ হচ্ছে, অহিংস মনোভাব। যখন আমি কারো উপর রেগে যাই, রাগ প্রদর্শন করি। কিন্তু আঘাত করে বসি না। সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ, জানি আমি। কিন্তু এখানে রেগে যাওয়াটা সমস্যা না। রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক, জীবনেরই একটা অংশ। বরং স্বাস্থ্যকর কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

রেগে গিয়ে কাউকে আঘাত করাটাই সমস্যা। রাগ না। রাগ এখানে কেবল বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করছে। আপনাকে রেগে গিয়ে আমি ঘুষি মারলে রাগের দোষ দেবেন না, দোষ দিতে হলে আমার মুঠো পাকানো হাতকে দিন (কিংবা আপনার চেহারাকে, যেখানে ঘুষিটা গিয়ে পড়েছে)।

আমরা যখন জোর করে ইতিবাচকতার পথে হাঁটছি, ঠিক তখনই জীবনের সমস্যা গুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছি। আর যখন সমস্যা থেকে মুখ রাখি, সুখের সম্ভাবনাও হেলায় হারিয়ে ফেলি। কারণ, সমস্যার সমাধান সুখের চাবিকাঠিস্বরূপ। সমস্যা উদ্ভূত হওয়ার মানে আমাদের জীবন নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাথা নিচু করে চলার মানে নিজেদের অস্তিত্ত্বকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করে ফেলা। সমস্যাবিহীন জীবন অর্থহীন।

দীর্ঘমেয়াদে, চকলেট কেক খাওয়ার চাইতে ম্যারাথনে অংশ নিতে পারলে আমাদের ভালো লাগে। সন্তানকে বড় করার আনন্দ ভিডিও গেমস খেলার আনন্দের চাইতে বেশি। বন্ধু-বান্ধবদের দিয়ে ব্যবসা করার উত্তেজনার কাছে নতুন কেনা কম্পিউটার কিছুই না। এই কাজকর্ম গুলো চাপ তৈরি করে, একই সাথে দুঃসাধ্য হতে পারে, কিছু কিছু সময় অপ্রীতিকরও বটে। নিরলস ভাবে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তগুলোই জন্ম দেয় নিখাদ আনন্দের। কারণ এতে মিশে আছে বেদনা, পরিশ্রম এমনকি হতাশা, রাগ। এরপর কোন একদিন, ভেজা চোখে এই যন্ত্রণাময়, বিপদসঙ্কুল যাত্রার গল্প শোনাই নাতি নাতনিদের।

ফ্রয়েড বলেছিলেন, পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, সংগ্রামের দিনগুলোই শ্রেষ্ঠ মনে হচ্ছে। ফিরিয়ে ক আর ঠিক এই কারণেই আনন্দ, বস্তুগত সাফল্য, সবসময় সঠিক হওয়া আর ইতিবাচক মনোভাব- এই মূল্যবোধগুলো আদতে নিকৃষ্টতম। জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো আনন্দময় কিংবা সফলতার গল্প না-ও হতে পারে।

এত কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো কিছু মুল্যবোধ আর মানদণ্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। আনন্দ আর সফলতা এমনিতেই আসবে। সঠিক মূল্যবোধের পুরস্কার স্বরুপ এগুলো আসবেই। মূল্যবোধ ছাড়া এই আনন্দ আর সফলতার কোন দাম নেই।

সঠিক আর ভুল মূল্যবোধের পরিচয়

সঠিক মূল্যবোধ হচ্ছে- ১) বাস্তব সম্মত ২) সামাজিক ভাবে গঠন মূলক ৩) তাৎক্ষণিক এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

ভুল মূল্যবোধ হচ্ছে- ১) কুসংস্কার ২) সামাজিকভাবে নাশকতামূলক ৩) অ- তাৎক্ষণিক এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সততা সঠিক মূল্যবোধের মধ্যে অন্যতম। কারণ এর উপর আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। এটা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। এর ফলে অন্যরাও উপকৃত হয় (মাঝে মাঝে অস্বস্তির জন্ম দিলেও)। অন্যদিকে, জনপ্রিয়তাকে ভুল মূল্যবোধ বলা যায়। আপনি যদি একে বেশি গুরুত্ব দেন এবং আপনার লক্ষ্য যদি থাকে নাচের পার্টির সবচেয়ে পছন্দের ছেলে/মেয়ে হওয়া, পরবর্তী ঘটনাগুলোর উপর আপনার খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেখানে আরও কারা থাকবে। আপনি অর্ধেক লোককে চেনেনও না। দ্বিতীয়ত, এই মূল্যবোধ আর তার মানদন্ডবাস্তবতার উপর নির্ভর করে না। লাকে কী ভাবল তা না জেনেও আপনি নিজেকে অনেক জনপ্রিয়/অজনপ্রিয় ভেবে বসে থাকতে পারেন। (মনে রাখুন-কে কী ভাবল তা নিয়ে মানুষ সব সময় ভীত থাকে। কারণ তারা ভয় পায় বাকি সবাই তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে, নিজের দুর্বলতা অন্যদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে ভেবে)।

কয়েকটা সঠিক বা স্বাস্থ্যকর মূল্যবোধের উদাহরণ হচ্ছে- সততা, উদ্ভাবনীয় ক্ষমতা, আত্মসম্মান, কৌতূহল, দানশীলতা, নম্রতা, সৃজনশীলতা, বিপদে কারা পাশে দাঁড়ানো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারা।

অন্যদিকে কিছু ভুল বা অস্বাস্থ্যকর মূল্যবোধের পরিচয় দেয়া যাক- হিংসাত্মক মনোভাব, কর্তৃত্ব ফলানো, অন্যকে বিপথে চালিত করা, সব সময় উচ্ছ্বসিত থাকা, নিজেকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভাবা, একাকিত্বে না ভোগা, সবার পছন্দের পাত্র হওয়া, ধনী হবার লক্ষ্যে ধনী হওয়া কিংবা পৌত্তলিক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিরীহ প্রাণী বলি দেয়া।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, স্বাস্থ্যকর মূল্যবোধগুলো আসে নিজের ভিতর থেকে। যেমন, সৃজনশীলতা কিংবা নম্রতার মতো মূল্যবোধের দেখা চাইলেই পাওয়া যায়। আপনি স্রেফ মনোনিবেশ করলেই বুঝতে পারবেন। এই মূল্যবোধগুলো তাৎক্ষনিক আর আপনার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে।

খারাপ মূল্যবোধগুলো কিন্তু আবার বাহ্যিকতার উপরে নির্ভরশীল। মানে আপনার সাথে যা ঘটবে, তা অনুযায়ীই এই মূল্যবাধগুলো তৈরি হবে। যেমন- ব্যক্তিগত জেট বিমানে ভ্রমণ করা, সব সময় তোষামোদ পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, বাহামা দ্বীপপুঞ্জে বাড়ি কেনা, ময়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করা। এই মূল্যবোধের চর্চা মাঝে মাঝে আনন্দময় মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঠেলে দিতে পারে ধ্বংসের পথে কিংবা আপনাকে বানিয়ে দিতে পারে লোভী।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, তাদের গুরুত্ নির্ধারণ করাই আসল ব্যাপার। সবারই ভালো লাগে ভালো খাবার খেতে, সন্দরী নারীর সাহচর্য পেতে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে তাদের গুরুত্ব। কোন মুল্যবোধের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি আপনার কাছে। কোন সেই মূল্যবোধ যেটা আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জুমিকা পালন করে?

হিরু অনোদার সর্বোচ্চ গুরুত্ব ছিল জাপানিজ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। এটিই তার মূল্যবাধ।তার সম্পর্কে এতো পড়েও যদি কোন কারণে আপনি তা না বুঝতে পারেন, তাহলে জেনে নিন, তার এই মূল্যবোধ স্রেফ গবাব ছড়িয়েছে, কারো কোন উপকার হয়নি। এটি হিরুর জন্য মারাত্মক সমস্যা তৈরি করে। তিনি একটা দূরবর্তী দ্বীপে পোকা-মাকড়ের মাঝে ত্রিশ বছর আটিকে ছিলেন। এমনকি, অসংখ্য বেসামরিক নিরপরাধ লোককেও তিনি হত্যা করেছেন। হিরু নিজেকে যতই সফল ভাবুক, তার মানদন্ডঅনুযায়ী চলুক, আমরা সবাই একমত হতে পারি,তার ওটা কোন জীবনই নয়। নিশ্চয়ই আমাদের কেউই তার পথে যেতে চাই না। তার কর্মকান্ডও সমর্থন করি না।

ডেভ মাস্টেইন যথেষ্ট যশ-খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু নিজেকে ব্যথ ভাবেন। কারণ তিনি অন্যের সাফল্যের সাথে নিজের ফালতু তুলনার ধারণায় আটকে ছিলেন। এই মানসিকতা তাকে একটা অদ্ভুত সমস্যায় ফেলে। যেমন- ১৫০ মিলিয়নের বেশি অ্যালবাম বিক্রি করতে পারলে তবেই সবকিছু ঠিকঠাক হবে। আর আমি স্টেডিয়াম ছাড়া অন্য কোথাও কনসার্ট করবোই না। তার ধারনা ছিল এই সমস্যাগুলে সিমাধান করতে পারলেই তিনি সুখের সন্ধান পাবেন। নিঃসন্দেহে তা পাননি।

অন্যদিকে, পিট বেস্ট নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনেন। বিটলস থেকে বের করে দেওয়ায় তিনি ঠিকই হতাশা এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সময়ের সাথে তিনি তার অগ্রগণ্য বিষয়গুলো সাজিয়ে ফেলেন। নতুন আলোয় তার জীবনকে আলোকিত করে তোলেন। এ কারণে, বেস্ট পরিবার নিয়ে সুন্দর ও সুখী জীবন উপভোগ করেন। অন্যদিকে বাকি চারজন বিটলস দশক ধরে চেষ্টা করেও এসব জিনিস অর্জন করতে পারেনি। সুন্দর ও সুখী জীবন উপভোগ করেন । অন্যদিকে বাকি চারজন বিটলস দশক ধরে চেষ্টা করেও এসব জিনিস অর্জন করতে পারেনি ।

যখন আমরা ভুল মূল্যবোধকে বেছে নিই; আচ্ছা অন্যভাবে বলা যাক। যখন নিজেদেও মাপকাঠিকে নিম্ন স্তরে নামিয়ে আনি,তখন আসলে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অহেতুক মাথা ঘামিয়ে ফেলছি আমরা। যেগুলো বরং আমাদের জীবনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে সেসব নিয়েই চিন্তাশক্তি খরচ করে ফেলছি। কিন্তু যখন সঠিক মূল্যবোধকে বেছে নিচ্ছি, তখন স্রেফ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই পূর্ণ মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। জীবনে যে গুলোর প্রভাব আছে, যা বয়ে আনতে পারে সুখ, আনন্দ আর সাফল্য।

আত্ম-উন্নয়নের মূলকথা এটাই, মূল্যবোধের গুরুত্ব নির্ধারণ করা। প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মাথা ঘামানো। কারণ আপনি যখন স্রেফ জরুরী ব্যাপার নিয়েই ঘাম ঝরাচ্ছেন, তখনই নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আর তুলনামূলকভাবে উন্নত আর নতুন সমস্যার আবির্ভাব মানে আপনার জীবনযাত্রার মান বেড়ে গেছে।

বইয়ের বাকি অংশে পাঁচটি ভিন্নধর্মী মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলা হবে।আগে বলা ব্যাকওয়ার্ড ল এর মূল বিষয়টা মাথায় রাখুন। ব্যাকওয়ার্ড লর সূত্রানুযায়ী এই মূল্যবোধগুলো নেতিবাচক ধরণের। কিন্তু দিনশেষে এই নেতিবাচক মূল্যবোধই আপনার জন্য উপকারী হবে। গভীর সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে মুখোমুখি হবার শিক্ষা দেবে। পাঁচটি মূল্যবোধই সাধারণের কাছে রীতিবিরুদ্ধ আর অস্বস্তিদায়কও মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে জীবন বদলে দেয়ার মতো।

প্রথম মূল্যবোধের সাথে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পরিচিত হবো। ধরা যাক, মূল্যবোধটার নাম, উদ্ভট রকমের দায়িত্ববোধ। দায় যারই থাকুক না কেন, সবকিছুর দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেবার প্রবণতা। দ্বিতীয় হচ্ছে, অনিশ্চয়তা। নিজের অজ্ঞতাকে স্বীকার করতে পারা। নিজের ধ্যান-ধারণাকে নিখুঁত মনে না করা। এরপরের মূল্যবোধটি হলো ব্যর্থতা। নিজের ভুলত্রুটি উপলব্ধি করতে পরার করার সৎ সাহস থাকা, যাতে তা শুধরে নেবার সুযোগ পাওয়া যায় । চতুথ, প্রত্যাখ্যান। না বলতে আর শুনতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা। জীবনে কী চান আর কী চান না, সেটা মুখ ফুটে বলতে পারার ক্ষমতা। পাঁচ নাম্বার এবং সবশেষ মূল্যবাধ, মৃত্যুকে স্মরণ করা। মানুষ মাত্রই মরণশীল, সেটাকে প্রতিনিয়ত মাথায় রেখে চলা। এই মূল্যবাধটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়, কারণ এর মাধ্যমে অন্য সব মূল্যবোধও পূর্ণতা পায়

অধ্যায় ৫

আপনি সবসময় কিছু না কিছু বেছে নিচ্ছেন

একবার ভাবুন, কেউ আপনার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বলছে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ২৬.২ মাইল দৌড়াতে। তা নাহলে সে আপনাকে সপরিবারে মেরে ফেলবে।

খুবই বিরক্তিকর কথা।

এবার ভাবুন, আপনি একজোড়া সুন্দর এবং ভালো জুতো কিনেছেন। মাসের পর মাস নিয়ম মেনে নিজেকে গড়ে তলেছেন। আপনার প্রথম ম্যারাথন শেষ করার সময় কাছের বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে।

এটা আপনার জীবনের অন্যতম গর্বের মুহূর্ত।

সেই একই ২৬.২ মাইল। আপনিই দৌড়েছেন। আপনার পায়ের উপর দিয়ে একই রকম চাপ গিয়েছে। কিন্তু যখন আপনি স্বাধীনভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে তৈরি করে নেন, তা আপনার জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তে পরিণত হেলা। যখন আপনার উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হলো, তা আপনার জীবনের স্বচেয়ে ভীতিকর এবং যন্ত্রণার অভিজ্ঞতায় রূপ নিলো।

আসলে স্বেচ্ছায় নেয়া সিদ্ধান্তগুলো খুব একটা ঝামেলার মনে হয় না। অপরদিকে, অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন কাজ করতে হলে, তা খুবই ঝামেলার কারণ হয়ে দাড়ায়।

কোন বাজে পরিস্থিতিতে দুর্বিষহ হয়ে পড়ার কারণ হতে পারে বিষয়টি আপনার নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে মনে করা। সমস্যাটি মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই অথবা আপনার অনিচ্ছায় সত্ত্বেও তা আপনার কাধে চেপে বসেছে মনে করা।

যখন আমরা নিজের ইচ্ছাতে কোন কাজ করি, তখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়। অপরদিকে, যখন আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ভাবি, তখন হতাশায় মুষড়ে পড়ি।

সিদ্ধান্ত নেয়া

উইলিয়াম জেমস নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন।

বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মালেও, জন্ম থেকেই জেমস স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ছিলেন। চোখের সমস্যার কারণে ছোটবেলাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। পাকস্থলীর সমস্যার কারণে তার প্রচুর বমি হতো। বাধ্য হয়ে তাকে বিশেষ খাবার গ্রহণ করতে হতো। শ্রবণজনিত সমস্যাও ছিল। তার পিঠের ব্যাথা এত তীব ছিল যে টানা কয়েকদিন তিনি উঠে বসতেও পারতেন না।

এসব স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে জেমস বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই কাটাতেন। তার খুব বেশি বন্ধুও ছিল না। এবং স্কুলেও খুব বেশি একটা সুবিধের ছিলেন না। তিনি আঁকাআঁকি করেই সময় কাটাতেন। এই একটা কাজ করেই তিনি আনন্দ পেতেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ ভাবেনি যে তিনি ভালো আঁকতে পারেন। যখন তিনি বড় হলেন, কেউ তার ছবি কিনতো না। কয়েক বছর পরে, তার পিতা (প্রসিদ্ধ এক ব্যবসায়ী) তার অলসতা এবং মেধার অভাবকে টিপ্পনি কাটতে শুরু করে।

একই সময়, তার ছোট ভাই হেনরি জেমস, ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি কুড়ান। তার বোন,অ্যালিস জেমস, লেখিকা হিসেবে ভালোই অবস্থান অর্জন করেন। উইলিয়াম, পরিবারের বোঝা এবং কলঙ্কে পরিণত হন।

তার ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য তার পিতা মরিয়া হয় উঠেন। তিনি ব্যবসায়িক প্রভাব কাজে লাগিয়ে জেমসকে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি ছেলেকে জানিয়ে দেন এটাই তার শেষ সুযোগ। সে যদি কোন ঝামেলা করে, তার আর কোন আশাই নেই।

কিন্তু জেমস হার্ভার্ডে মানিয়ে নিতে পারেননি। মেডিসিন তাকে কখনই আকর্ষণ করেনি। তার কাছে সবকিছু প্রবঞ্চনা মনে হয়ত। সবকিছু বাদ দিলেও, সে যদি নিজের সমস্যাই সমাধান করতে না পারেন তাহলে কিভাবে অন্যের সমস্যার সমাধান করবেন? মানসিক বিভাগ ঘুরে এসে জেমস তার ডায়েরিতে লেখেন, ডাক্তারের থেকে রোগীদের সাথে তার মিল বেশি।

কয়েক বছর বাদে, আবারো পিতার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে জেমস মেডিকেল স্কুল ছেড়ে দেন। কিন্তু পিতার রক্তচক্ষুর সামনে পড়ার থেকে তিনি অন্য সিদ্ধান্ত নেন। আমাজনের রেইন ফরেস্ট নৃতত্ত্ব অভিযানে নাম লেখান।

এটা ১৮৬০ সালের কথা। আন্তঃমহাদেশীয় ভ্রমণ কঠিন এবং বিপদজনক ছিল। ছোট বয়সে কম্পিউটারে অরগন ট্রেইল গেম খেলে থাকলে বুঝতেন।

যাই হোক, জেমস আমাজনে ঠিকমতোই পৌছে যান। মূল অভিযান এর পরেই শুরু হয়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, তার ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি কোন

ঝামেলা ছাড়াই আমাজনে পৌছেন। কিন্তু এরপরেই ঘটে বিপত্তি। অভিযানের প্রথম দিনেই তার গুটি বসন্ত হয়, জঙ্গলে তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন।

তার পিঠের ব্যাথাও ফিরে আসে। এতটাই তীব্র, যে জেমস হাঁটতেও পারছিলেন না। গুটি বসন্তের কারণে তিনি প্রচণ্ড কাহিল হয়ে পড়ন। পিঠের ব্যথার কারণে চলতেও সমস্যা হচ্ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে কোন এক জায়গায় তাকে একা ফেলে রাখা হয় (বাকি অভিযান তাকে ছাড়াই হয়)। বাড়ি ফেরার কোন সঠিক রাস্তা তার জানা ছিল না। আর সেটাও কমপক্ষে এক মাসের যাত্রার ধাক্কা। তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

কিন্তু যেভাবেই হোক, তিনি নিউ ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। যেখানে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত পিতার মুখোমখি হন। এতোদিনে তিনি আর কমবয়স্ক নেই। প্রায় ত্রিশ ছুইছুই বয়স তার। এখনও বেকার, যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই ব্যথ হয়েছেন। শরীরও তার সাথে প্রতারণা করছে, ভালো হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। জীবনে এত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরেও সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। হতাশা এবং দুর্দশাই তার জীবনের একমাত্র সত্যে পরিণত হয়েছে। হতাশা জেমসকে চেপে ধরে। তিনি জীবন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন।

একরাতে তিনি দার্শনিক চার্লস পিয়ার্সের লেকচার পড়ছিলেন। জেমস ছোট্ট একটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেন, আগামী এক বছর তিনি বিশ্বাস করবেন, তার জীবনে ঘটে যাওয়া সব কিছুর জন্য তিনিই শতভাগ দায়ী থাকবেন। এই সময়ে তিনি শত বাধা উপেক্ষা করে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। যদি সেই এক বছরে কিছুই না হয়, তাহলে তিনি ধরে নেবেন সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তার যথেষ্ট সামথ্য নেই। এরপর বেছে নেবেন আত্মহত্যার পথ।

তারপর? উইলিয়াম জেমস আমেরিকান মনস্তত্ত্বের জনকে পরিণত হন। তার লেখা অজস্র ভাষায় অনুদিত হয়, এবং তাকে তার সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক বলে বিবেচনা করা হয়। এরপর তিনি হার্ভার্ডে শিক্ষকতা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের লেকচার দিয়ে বেড়ান। বিয়ে করে তিনি পাচ সন্তানের জনক হন (তার এক ছেলে বিখ্যাত জীবনীকার হেনরি, পুলিৎজার পুরষ্কার জিতেন)। পরবর্তীতে জেমস তার ঐ ছোট পরীক্ষাকে পুনর্জন্ম আখ্যা দেন এবং তার সমস্ত অর্জনের কৃতিত্বও ঐ পরীক্ষামূলক কাজকে দেন।

ব্যক্তিগত সকল উন্নতি, প্রগতি ছোট একটা উপলব্ধি থেকেই আসে। আর তা হলো, যত কিছুই ঘটে থাকুক, আমরা নিজেরাই আমাদের অবস্থার জন্য দায়ী।

আমাদের সাথে ঘটা, সবকিছু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। কিন্তু আমরা সবসময়ই তার ব্যাখ্যা করত পারি। পরবর্তী পদক্ষে ঠিক করতে পারি।

সচতনভবে স্বীকার করি বা না করি, আমাদের অবস্থার মুলে রয়েছে অমদের কর্মকান্ড। এর বাইরে কিছু না। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের বেছে নেয়া সদ্ধত উপরই সব নির্ভর করছে।

পছন্দ হোক বা না হোক, আমাদের কর্মকান্ডের উপরই নির্ভর করে, আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিটি সময় এবং ঘটনার অনুধাবন করছি। চলার মূল্যবোধ এবং মানদন্ড তৈরি করে সেগুলো মেনে চলছি। কোন ঘটনা ভালো কিংবা খারাপ তা অনেকসময় আমাদের নির্ধারিত মানদন্ডের উপর নির্ভর করে।

বিষয় হলো, স্বীকার না করতে চাইলেও আমরাই আমাদের পছন্দ বেছে নিচ্ছি, প্রতিনিয়ত।

কোন না কোন বিষয় নিয়ে আমাদের বিশেষ তৎপরতা থাকবেই। মূল বিষয়টি হলো, আমরা কোন জিনিস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠব। আমাদের কাজের জন্য কী ধরনের মূল্যবোধ ঠিক করছি। জীবনকে মূল্যায়নের জন্য কী বরনের মানদন্ড ঠিক করছি। এবং এসব মূল্যবোধ, মানদন্ড বাছাই সঠিক হয়েছে কিনা।

দায়িত্ব আর দোষের ভুল ধারণা

কয়েক বছর আগে, আমার বয়স এবং বিচার-বুদ্ধি দুটোই কম ছিল। আমি একটা ব্লগ পোস্ট করি। একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন বিশেষ ক্ষমতার সাথে বিশেষ দায়িত্বও চলে আসে। কথাটা শুনতে গুরুগম্ভীর এবং পান্ডিত্যপূর্ণ লাগে। আমি জানতাম না, কে বলেছিল। আমি গুগলে খুঁজে কিছু পেলাম না। কিন্তু আমি লাইনটি রেখে দিই। পোস্টের সাথে মিলে গিয়েছিল কথাটা।

প্রায় দশ মিনিট পরে, প্রথম কমেন্ট আসলো। আমার মনে হয়, বিখ্যাত দার্শনিক বলতে আপনি স্পাইডার ম্যান মুভির আঙ্কেল বেনকে বুঝিয়েছেন।

বিশেষ ক্ষমতার সাথে বিশেষ দায়িত্বও চলে আসে। পিটার পার্কারের ছেড়ে দেয়া চোরের হাতে ফুটপাথে মানুষের সামনে আঙ্কেল বেন নিহত হন। এটাই ছিল তার শেষ কথা। সেই বিখ্যাত দর্শন।

তা-ও, আমরা সবাই এই দার্শনিক উক্তিটি শুনেছি। উক্তির মূল ভাবের সাথে আপনি বহু আগে থেকেই পরিচিত, স্রেফ কখনো মাথা ঘামাননি সেটা নিয়ে।

তবুও, আপনার জানা এই একইজিনিস আপনাকে বারবার শোনানো হচ্ছে ।

বিশেষ ক্ষমতার সাথে বিশেষ দায়িত্বও চলে আসে।

এটা সত্যি। কিন্তু এই উক্তির আরও ভালো একটা সংস্করণ রয়ছে। যা আরও গভীর। আপনাকে শুধু নাম পদটা বদলে দিতে হবে। বিশেষ দায়িত্বের সাথে বিশেষ ক্ষমতাও চলে আসে।

জীবনে যত দায়িত্ব নেওয়া হবে, তত বেশি ক্ষমতার ব্যবহার করা হবে। সমস্যার সমাধানের প্রথম ধাপ হলো, দায়িত্ব নিয়ে তার মোকাবেলা করতে চাওয়া।

আমার পরিচিত এক লোক ছিলেন। তিনি সবসময় ভাবতেন, খাটো হওয়ায় কোন মেয়েই তার সাথে ডেট করবে না। তিনি শিক্ষিত, দেখতে শুনতে ভালো, অনেক মজার ছিলেন। কিন্তু তিনি ধরেই নিয়েছিলেন কোন মেয়েই তার সাথে ডেটে যাবে না।

তার এই মনোভাবের কারণে তিনি মেয়েদের সাথে ওভাবে মেশার চেষ্টা করতেন না। যে কয়বার চেষ্টা করেছেন, নিজেকে অনাকর্ষণীয় ভেবে বেশিদুর আগানোর সাহস করতেন না। বুঝতেই পারছেন তার ডেটিংগুলো বাজে যেত।

তাকে যে বিষয়টি পীড়া দিত,সেটা তার উচ্চতা।তিনি এই বিষয়টাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। এ ব্যাপারটি তিনি বুঝতেন না। তার ধারণা মেয়েরা শুধু মাত্র উচ্চতার প্রতি আকর্ষিত হয়।

এই বোধটি তাকে আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে। সেইসাথে তাকে একটা উদ্ভট সমস্যায় (তার ধারণা) ফেলে দেয়ঃ লম্বা মানুষের পৃথিবীতে উপযুক্ত লম্বা না হতে পারা। ডেট করার জন্য তিনি এর থেকে হাজার গুণ ভালো মুল্যবোধ ঠিক করতে পারতেন। আমার যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট মেয়েদের সাথেই ডেট করব।এভাবে শুরু করলে ভালাই হতো। এই মানদন্ডে তার মূল্যবোধ, সততা এবং গ্রহণ যোগ্যতার মূল্যায়ন হতো। কিন্তু তিনি এই মূল্যবোধ গ্রহন করেননি। তিনি না বুঝতে পারলেও, এই বিষয়টিই তার সমস্যার প্রধান কারণ।

দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে তিনি বারডোরের কাছে অভিযোগ করা শুরু করেনঃ আমার কোন সুযোগ নেই। আমি কিছুই করতে পারব না। মেয়েরা অনেক দাম্ভিক। তারা আমাকে কখনোই পছন্দ করবে না। ছিচকাদুনে একটা পুরুষকে পছন্দ না করাটা সকল মহিলারই দোষ বলে গণ্য।

অনেকেই তাদের সমস্যার সামনে দাড়িয়ে দায়িত্ব নিতে দ্বিধাবোধ করেন। তারা সমস্যার দায়িত্ব নেওয়াটাকে ঝামেলা মনে করেন।

আমাদের সমাজে দায়িত্ব এবং দোষ,প্রায়ই দুটো জিনিস একসাথে বিবেচিত হয়। কিন্তু তারা এক জিনিস নয়। আপনাকে যদি আমি গাড়ি দিয়ে ধাক্কা দিই, তাহলে আমি একইসাথে দোষী এবং আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেয়াটাও আমার দায়িত্ব। এমনকি দুর্ঘটনায়, আঘাত করলেও আমি দায়ী।

কিন্তু আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলোর জন্য আমরা দোষী না হলেও সেগুলোর জন্য দায়ী ।

যেমন, আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আপনার দরজার সামনে একটা নবজাত শিশু। এটা আপনার দোষ নয়। কিন্তু এখন শিশুটি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ল। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন কী করবেন। এবং আপনি যে সিদ্ধান্তই নিবেন (শিশুটিকে রেখে দেওয়া, পাশ কাটিয়ে এর থেকে মুক্তি) তার উপর নির্ভর করবে পরবর্তী সমস্যাগুলো। এবং সেগুলোর জন্যও আপনি দায়ী।

বিচারকগণ তাদের মামলা নির্বাচিত করেন না। আদালতে যখন একটি মামলা যায়, বিচারক তো আর সেই অপরাধ করেনি, সেই অপরাধের সাক্ষীও নন, সেই অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তও নন। কিন্তু তিনি সেই অপরাধের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিচারককে পরবর্তী পরিণামগুলো চিন্তা করতে হয়। তাকে অবশ্যই একটা মানদন্ড নির্ধারন করে অপরাধটির গুরুত্ব বিবেচনা করতে হয়। এবং সেভাবেই তিনি রায় দেন।

আমরা সকল ক্ষেত্রে শুধু মাত্র আমাদের ভুলের জন্য দায়ী থাকব এমনটা নয়।

জীবন এমনই।

ধারণা দুটির আরেকটা পার্থক্য দেখাই। দোষ হলো অতীত কাল, আর দায়িত্ব হলো বর্তমান। দোষ, আমাদের পূর্ব নির্ধারিত পছন্দের উপর নির্ভর করে। আর আমরা প্রতিটি মুহূর্তে যা বেছে নিচ্ছি, সেটিই হলো দায়িত্ব। আপনি এই বইটিকে বেছে নিয়েছেন। ধারণাগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন, গ্রহণ অথবা বর্জন করছেন। আমার ধারণাগুলো অবান্তর ভাবাটা আপনার দোষ হতে পারে। কিন্তু আপনি যে সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন, তার পুরো দায়িত্ব আপনার। আমি যা লিপেছি, তার জন্য আপনার কান দোষ হতে পারে না। কিন্তু আপনি নিজ দায়িত্বেই এই বইটি পড়ছেন (অথবা পড়ছেন না)।

আপনার অবস্থার জন্য আপনি অন্যকে দায়ী করতে পারেন। কিন্তু তাতেই সেই ব্যক্তি সত্যিকারের দায়ী হবেন এমনটা নয়। আপনার অবস্থার জন্য একমাত্র আপনিই দায়ী। আপনার করুণ অবস্থার জন্য অনেককে দায়ী করতে চাইলেও, আপনিই তার জন্য দায়ী। কারণ, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়া

আপনিই নির্ধারণ করেন। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা পরিমাপের মানদণ্ড আপনিই বেছে নেন।

আমার প্রথম প্রেমিকা আমাকে অসাধারণভাবে ছেড়ে যায়। সে তার শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক করে আমার সাথে প্রতারণা করছিল। অসাধারণ বলছে বোঝাচ্ছি, কেউ যেন আমার পেটে গুণে গুণে দুইশত তিপান্নটা ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে তখনি আমাকে ছেড়ে চলে যায়। তিন বছর একসাথে থাকার পর এভাবেই এক তুড়িতে সব হারিয়ে গেল।

আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। অনেকবার তাকে ফোন করেছি, চিৎকার করেছি, তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য কেঁদেছি, তার বাড়িতে গিয়ে চমকে দিয়েছি সাবেক প্রেমিকরা যেসব পাগলামি করে সবই করেছি, কিন্তু লাভ হয়নি। আমি তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করত পারিনি। আমার অসহায় অনুভূতির জন্য তাকে দায়ী করি। কিন্তু আমার অসহায় অনুভূতির জন্য সে নয়, আমিই দায়ী।

চোখের জল ঝরিয়ে আর মদ গিলে, আমার মনোভাবে পরিবর্তন আসে। সে আমার সাথে যা করেছে তা অবশ্যই খারাপ, তার জন্য নিন্দাও করা যায়। কিন্তু এখন আমাকে খুশি রাখার দায়িত্ব আমারই। সে এসে আবার আমার জীবনকে গুছিয়ে দিবে না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

এ পথ ধরার পর, কয়েকটা ঘটনা ঘটে। প্রথমত, আমার অবস্থার উন্নতি ঘটে। বন্ধুদের সাথে সময় দিতে থাকলাম (যাদের আমি এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিলাম)। নতুন নতুন মানুষের সাথে মেশা শুরু করলাম।ধীরে ধীরে, আমার ভালো লাগা শুরু হল।

আমি এখনও আমার সাবেক প্রেমিকার উপর ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু এখন অন্তত আমি আমার আবেগের দায়িত্বটা নিই। মানে, মূল্যবোধটার সংস্কার করেছি। পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে নিজের প্রতি যত্নশীল হয়েছি।

প্রায় এক বছর পর, মজার একটা ঘটনা ঘটল। আমি আমাদের সম্পর্কের কথা চিন্তা করলাম। কিছু সমস্যা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু তখন ধরতে পারলাম। যেসব সমস্যার জন্য আমাকে দায়ী করা যায়, আমি চাইলে সেগুলো সমাধানের কাজও করতে পারতাম। আমি বুঝতে পারি, বয়ফ্রেন্ড হিসেবে আমি খুব একটা আহামরি ছিলাম না এবং একজন মানুষ হঠাৎ করেই আরেকজনের সাথে প্রতারণা করেনা। কোন কারণে অসুখী হলে তবেই তারা এমনটা করে।

আমি বলছি না এ কারণে, ও দায়মুক্তি পেয়ে গেল। কিন্তু আমার ভুলগুলো ধরতে পারায় আমি বুঝতে পারি, আমি নিজেকে নিরীহ বলি ভাবলেও বিষয়টি সঠিক নয়। একটা ফালতু সম্পর্কটা টেনে আনতে আমি অনেক কিছু করেছি।

আসলে, একই ধরনের মূল্যবোধসম্পন্ন কারো সাথেই মানুষ ডেট করে। এবং আমি যদি ফালতু মূল্যবোধসম্পন্ন কারো সাথে এতদিন ডেট করে থাকি তাহলে আমার এবং আমার মূল্যবোধের কী হলো? আপনি যদি স্বার্থপর এবং ক্ষতিকারক কারো সাথে সম্পর্ক করেন, তবে আপনি নিজেও ক্ষতিকারক। এই জিনিসটা আমি একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে শিখেছি, এই যা।

সব শেষ হওয়ার পর, অতীতে ফিরে আমি ওর চরিত্রের বিপদসঙ্কতগুলো খুঁজে পাই। তখন এসব আমি এড়িয়ে যেতাম। ওটা আমার ভুল ছিল। আমিও ওর জন্য সেরা বয়ফ্রেন্ড ছিলাম না। এমনকি আমি ওর সাথে অনেক সময় দর্ব্যবহার করেছি, কষ্ট দিয়েছি। আমারও এসব ভুল ছিল।

আমার ভুলগুলোতে কি তার ভুলগুলো ন্যায্যতা পেলো? না। কিন্তু তারপরেও, আমি এসব ভুল শুধরানোর মানসিকতা অর্জন করেছি। এবং বিপদসঙ্কেতগুলো আর কখনো এড়িয়ে না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নিশ্চিত করেছি, যেন আমাকে আবারো একই যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে না হয়। আমি এসব দায়িত্ব নেয়ায়, আমার পরবর্তী সম্পর্কগুলো অনেক ভালো হয়েছে। আর কোন বান্ধবী/প্রেমিকা আমার সাথে প্রতারণা করেনি, পেটেও দুইশত তিপান্নটা ঘুষি পড়েনি। আমি নিজের সমস্যাগুলো দায়িত্ব নিয়ে বের করে ঠিক করেছি। অসুখী সম্পর্কে আমার দায় খুঁজে তার সমাধান করেছি।

ও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, আমার জীবনের অন্যতম কষ্টের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণাও। আমার মানসিকভাবে বেড়ে ওঠার পিছনে আমি এই ঘটনাকে অনেক গুরুত্ব দেই। এক ডজন সফলতার থেকেও ঐ একটি ঘটনায় আমি বেশি শিখতে পেরেছি।

আমরা সফলতা এবং সুখের কৃতিত্ব নিতে চাই। হায়!প্রায়ই তা নিয়ে অন্যের সাথে ঝগড়া করি। কিন্তু আমাদের সমস্যার দায় নিতে চাওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আসল শিক্ষাটা সেখান থেকেই পাওয়া যায়। জীবনের প্রকৃত উন্নতি করার পথ বের করা যায়। অন্যকে দায় দিলে শুধু নিজেকেই কষ্ট দেওয়া হবে।

দুঃসময়কে মোকাবেলা করা

কিন্তু ভয়ানক ঘটনাগুলোর কী হবে? এমন অনেক মানুষ আছে যারা ঠিকঠাক মতোদায়িত্ব পালন করেন না। যেমন, বাচ্চাদের সময় না দিয়ে অথবা যথার্থ কিছু না করে খামোখা বসে বসে টেলিভিশন দেখে। কিন্তু যখন কোন বিপদ সামনে

চলে আসে, তারা সুযোগ বুঝে সেখান থেকে কেটে পরে তাকে মোকাবেলা না করেই।

চিন্তা করে দেখুন-ঘটনার তীব্রতা ভিতরের সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না, আপনার কিছু চুরি হলে, আপনি তো আর তার জন্য দোষী নন।কেউই এ ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে চায় না কিন্তু আপনার দরজার সামনে একটা শিশু এ পড়লে আপনার কাধে জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব চলে আসে।আপনি কি আতঙ্কে কাঁপতে থাকবেন নাকি পুলিশকে ফোন করবেন অথবা এমন ভাব করবেন যেন কিছুই ঘটেনি। আপনি দায়িত্ব নিয়েই ঠিক করতে হবে আপনি কী করবেন। চুরির ঘটনার দোষ আপনার না, কিন্তু চুরির পরের অবস্থার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কিভাবে সামাল দেবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে নির্ভর করে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মানসিক শক্তি বজায় রাখতে হবে, প্রয়োজন হলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে অবস্থা বুঝে।

২০০৮ সালে, তালেবানরা পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সোয়াত উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঐ অঞ্চলে দ্রুত তাদের উগ্রবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। টেলিভিশন, ফিল্ম সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুরুষ সঙ্গী ছাড়া কোন মহিলা বাড়ির বাইরে বের হতে পারতা না। মেয়েদের স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৯ সাল। এগারো বছরের পাকিস্তানি মেয়ে মালালা ইউসুফজাই, স্কুলের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। সে নিজের এবং পরিবারের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার এলাকার স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখে। পাশের শহরে মতবিনিময় সভাতেও অংশ নিতে থাকে। সে অনলাইনে লিখে,আমার শিক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস তালেবানদের কে দিয়েছে?

২০১২ সালে, চৌদ্দ বছর বয়সে একদিন স্কুল যাওয়ার পথে বাসে উঠে তার মুখে গুলি করা হয়। মুখোশ পড়া তালেবান যোদ্ধা অস্ত্র হাতে বাসে উঠে জিজ্ঞেস করে মালালা কে? বল্, নাহলে এখানে সবাইকে গুলি করবো।মালালা নিজের পরিচয় দেয়। এবং তালেবানটি সব যাত্রীর সামনে তার মাথায় গুলি করে।

মালালা কোমায় চলে গিয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে থাকে। তালেবানরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়, সে যদি কোনভাবে বেচে যায়, তাহলে তারা তাকে এবং তার পিতা দুজনকেই হত্যা করবে।

মালালা আজও বেঁচে আছে। সে এখনও মুসলিম দেশগুলোতে নারীর প্রতি সংঘাত এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে সে তার কর্মের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়। মুখে গুলি লাগায় তার শ্রেতার সংখ্যা বেড়েছে, এবং তাকে আরও শক্তিশালী করেছে। সে চাইলেই বলতে পারতো, আমি আর

পারছি না। কিংবা ;আমার আর কোন উপায় নেই। সেটা হলেও তার ইচ্ছামতোই হতো। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিপরীত পথ বেছে নেয়।

কয়েক বছর আগে, এই অধ্যায়ের কিছু ধারণা আমি ব্লগে লিখেছিলাম। সেখানে একজন কমেন্ট করেন, আমি অগভীর এবং ভাসাভাসা লেখা লিখি। মানুষের জীবনের সমস্যা নিয় আমার প্রকৃত কোন জ্ঞান নেই। তিনি লেখেন, কদিন আগে তার ছেলে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সত্যিকারের দুঃখ না ভোগ করায় তিনি আমাকে দায়ী করেন। তার সন্তানের মৃত্যুতে তার কষ্টের জন্য তাকে দায়ী করায় আমাকে গালমন্দ করেন।

নিঃসন্দেহে অনেকের তুলনায় ঐ ব্যক্তি অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন। তার সন্তানের মৃত্যু তার ইচ্ছেতে হয়নি। সেখানে তার কোন দোষও নেই। কিন্তু সন্তান হারানোর কষ্ট বয়ে নেবার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে তার আবেগ, বিশ্বাস এবং কর্মের জন্য দায় নিতে হয়েছে। সন্তানের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জীবনে কোন না কোন উপায়ে দুঃখ-কষ্ট এসে হাজির হবেই। কিন্তু তাকে কিভাবে গ্রহণ করব, সেটা সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভের করে।ওই ব্যক্তিও জানে তার করার কিছুই ছিল না এবং সে শুধু তার সন্তানকে ফিরে পেতে চাইছে। সে তার দুঃখটাকে এভাবেই মোকাবেলা করছে।

অবশ্যই, এগুলোর কিছুই আমি তাকে বলিনি। তখন আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো আমি আসলেই না বুঝে কথা বলছি। আমি যে ধরণের কাজ করি তাতে এ ধরণের সমস্যা উদ্ভুত হতেই পারে। সমস্যাটা আমারই তৈরি করা। এবং তা আমারকেই এর সমাধান করতে হবে।

প্রথমে, আমার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পর, আমার রাগ লাগতে শুরু হল। নিজেকে বললাম, আমি আসলে যা বলতে চেয়েছি তার সাথে তার অভিযোগের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। আমার সন্তান মারা যায়নি দেখে আমি কষ্ট বুঝি না, এ কথার তো মানে হয় না।

তারপর আমি নিজের দেয়া উপদেশই মেনে চললাম। আমিই নিজের সমস্যা বেছে নিই। আমি এই মানুষটার উপর রাগ করে তর্ক করতে পারতাম। কিংবা দেখাতে চাইতে পারতাম যে তার সন্তান হারানোর কষ্টের চাইতে আমার নিজের ষ্ঠ বড়। কিন্তু এতে করেআমাদের দুজনকেই বেকুব ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। অথবা, আমি আরও বড় সমস্যা খুঁজে নিলাম। ধৈয্যধারণ করে, আমার পাঠকদের বোঝার চেষ্টা করলাম। এরপর থেকে দুঃখ কষ্ট নিয়ে লেখার সময় সবসময় তার কথা মনে রাখি।

তার শোকের জন্য সমবেদনা জানিয়ে বিষয়টা ওখানেই ছেড়ে দেই। আর কি বা করতে পারতাম?

জিনতত্ত্ব ও আমাদের অবস্থান

২০১৩ সালে বিবিসি ওসিডি, (obsessive-Compulsive Disorder)-তে ভোগা ছয়জন কিশোর কিশোরীদের নিয়ে কাজ করে। তাদের অযাচিত চিন্তাভাবনা এবং বারবার একই কাজ করার প্রবণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য গভীর থেরাপি দেয়া হয়।

সতেরো বছরের কিশোরী,ইমোজেন। সে যেখানেই হাঁটাচলা করতো, সে জায়গাটাতেই পা দিয়ে টোকা দিত। তার মনে ভয় ছিল এই পা দিয়ে টোকা না দিলে তার পরিবারের সবাই মারা যাবে। জস নামে আরেক ছলে ছিল, তার সবকিছুই শরীরের দুপাশ দিয়ে করতে হতো। ডান এবং বাম, দুহাত দিয়েই লোকের সাথে হাত মেলাত। দুই হাত দিয়ে খাবার খেত, দরজা দিয়ে দুপায়ে প্রবেশ করত। তা করতে না পারলেই, তার মাঝে অস্থিরতা তৈরি হতো। এবার আসি জ্যাকের কোথায়, একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত কিশোর ছিল সে। দস্তানা না পরে সে ঘর থেকে বের হতে চাইত না। পানি পান করার আগে ফুটিয়ে তবেই খেত। এবং | তার নিজের হাতের রান্না করা ছাড়া খাবার মুখে তুলত না।

ওসিডি ভয়ানক স্নায়ুবিক এবং বংশগত রোগ। তা নিরাময়ের অযোগ্য। খুব বেশি হলে, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি আসলে মূল্যবোধ পরিবর্তনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

এই প্রজেক্টের মনোবিদ প্রথমেই বাচ্চাদেরকে বলেন তাদের এই মানসিক পীড়নের সমস্যাকে মেনে নিতে হবে। এর মানে হলো, যখন ইমোজেনের মাথায় তার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ভয়াবহ চিন্তা আসে তখন তাকে মেনে নিতে হবে। তার পরিবারের সদস্যরা মারা যেতে পারে এবং এত তার করার কিছু নেই। সোজা কথায়, তার এ অবস্থার জন্য তার দোষ নেই। জসকে বুঝতে হবে, অস্থিরতা থেকেও সবকিছুতে এই সমতা করার প্রবণতা তার জীবনকে বেশি ঝামেলায় ফেলছে। এবং জ্যাককে মনে করিয়ে দেয়া হয়, সে যা কিছুই করুক না কেন, জীবাণুরা সবসময়ই তাকে ঘিরে রাখছে এবং তাকে যেকেনো সময় আক্রান্ত করতে পারে।

তাদের মূল্যবোধগুলো যে যুক্তিসঙ্গত নয় তা এই ছেলে-মেয়েগু নাকে বোঝানোই ছিল মূল লক্ষ্য। এমনকী এই মূল্যবোধগুলো তাদের নিজস্ব নয়, বরং

সমস্যাটির তৈরি করা নিজস্ব মূল্যবোধ। এবং এই অযৌক্তিক মূল্যনোধগুলো ধারণ করে তারা নিজেদের স্বাভাবিক জীবনকে ক্ষতিগস্ত করছে।

পরবর্তী পদক্ষেপে, তাদেরকে ওসিডির থেকে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে দেয়া হয়। যেমন, জসকে তার বন্ধু-পরিবারের কাছে নিজের সমস্যা না লুকিয়ে স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হলো ইমোজেনকে নিজের চিন্তাশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ এনে সুখী হতে বলা হলো। এবং জ্যাক, তাকে লম্বা সময় বাড়ির বাইরে থাকার সক্ষমতা অর্জনে গুরুত্ব দিতে বলা হলো।

কিশোর-কিশোরীদের এই নতুন হয়।এতেতারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, কেউ কাদতে শুরু করে, কেউবা হাত ছোঁড়াছুড়ি করতে লাগল। কিন্তু প্রামাণ্যচিত্রের শেষে দেখা গেল, ছেলেমেয়েদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। চলার পথে ইমোজেনের এখন আর সব জায়গাতে পা দিয়ে টোকা দিতে হয় না। ইমোজেনের ভাষ্যমতে, আমার মনে এখনও দানবটা লুকিয়ে আছে, হয়তোবা সারাজীবনই থাকবে। কিন্তু ওটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে।জস তারশরীরের দুপাশের ভারসাম্য রক্ষার কথা চিন্তা ছাড়াই পঁচিশ-ত্রিশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারে। তবে সম্ভবত জ্যাক এদের ন মূল্যবোধগুলো ধারণ করতে বলা মধ্যে সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে। ও এখন রেস্টুরেন্টে যেতে পারছে। বোতল খুলে গণ্ডাস না ধুয়েই তাতে পানি খেতে পারছে।আমি এই জীবন বেছে নিইনি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আমি তৈরি করিনি। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে কিভাবে আমি সামনে এগিয়ে যাব, তা আমাকেই বেছে নিতে হবে।-এই হলো জ্যাক এর উপলব্ধি।

অনেকেই প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। হোক তা ওসিডি অথবা শারীরিক গড়ন অথবা অন্য যেকোনো কিছু। তারা সবসময় ভাবে তাদেরকে হয়তো অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত করা হয়েছে সুবিধা প্রাপ্তিতে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য তারা কিছুই করতে পারবে না। আমার জিন তো আর আমি তৈরি করিনি। তো, কোনকিছু ঠিকঠাকমতো না হলে, তার দায় আমার নেয়ার দরকার নেই। এভাবে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে।

এটা সত্য যে, এখানে তাদের ভুল নেই।

কিন্তু একথাও সত্য যে, তাদেরকেই নিজেদের দায়িত্ব নিতে হবে।

কলেজে পড়ার সময় আমি পেশাদার পোকার খেলোয়াড় হওয়ার ভ্রমে আচ্ছন ছিলাম। আমি অনেক টাকা জিতেছি, আনন্দও পেয়েছি, কিন্তু প্রায় একবছর একাগ্রতা নিয়ে খেলে, আমি তা ছেড়ে দেই। রাত জেগে কম্পিউটারের দিকে

তাকিয়ে থাকা, এক রাতে হাজার হাজার টাকা জিতে পরের দিন বেশির ভাগ খুইয়ে ফেলা, জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে যুতসই নয়। কিন্তু সে সময়টা আমার জীবন দর্শনে ভালো প্রভাব রেখেছে।

পোকার খেলায় সবসময়ই ভাগ্য জড়িত থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র ভাগ্যই খেলার গতি নির্ধারণ করে না। কেউ একজন খুব বাজে কার্ড পয়েও, ভালো কার্ড পাওয়া খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিতে পারে। এখানে খেলাটার সৌন্দর্য্য। অবশ্যই ভালো কার্ড পাওয়া খেলোয়াড়ের জেতার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কিন্তু খেলোয়াড়ের বেছে নেয়া সিদ্ধান্তের উপরই খেলার ফল নির্ভর করে।

আমি জীবনকেও একই ভাবে দেখি। আমরা সবাই কার্ড পাচ্ছি। কেউ কেউ হয়ত ভালো কার্ড পাচ্ছে। দুর্বল কার্ড পেয়ে আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে পারি। কিন্তু আসল খেলাটা হলো, সেগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব। যারা ধারাবাহিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, পোাাকারে শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়। জীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযাজ্য। সফল হতে হলে,শুধুমাত্র ভালে কার্ডের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না।

অনেকেই জন্মগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত থাকে। অস্বীকার করা যাবে না, তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু এটা তারই দায়িত্ব, মনোবিদের কাছে গিয়ে থেরাপি নেয়া অথবা কিছু না করে বসে থাকা। সিদ্ধান্তের ভার তাকেই নিতে হবে। সমস্যাগুলোর সমাধান করে জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাস্তবতা হলো, প্রতিটি মানুষের জীবনেই বেদনাদায়ক ঘটনা রয়েছে, কষ্টের গল্প রয়েছে। কিন্তু এতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ারর কোন সুযোগ নেই। প্রতিটি স্বতন্ত্র ঘটনায় দায়িত্ব নিয়ে জীবনের মোড় ঘোরাতে হবে।

অসহায়ত্বের ভান

দায়িত্ব আর দোষের ভুল ধারণা সম্পন্ন মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো নিজেদের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। দোষারোপ করে দায়িত্ব এড়াতে পারলে মানুষ অল্প সময়ের জন্য নৈতিকভাবে স্বচ্ছ মনে করে নিজেকে, মনে করে তার নেয়া সিদ্ধান্তই সঠিক।

ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটা নেতিবাচক দিক হলো, এখানে দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার একটা প্রতিযোগিতা চলে। তুচ্ছ ঘটনাগুলোও অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। একটা বিশেষ শ্রেণী

কাছে এটা ভাব নেওয়ার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অন্যায়-অবিচার সংক্রান্ত কোন খবর দেখলেই মানুষ সামাজিক গণমাধ্যম গুলোতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যার আড়ালে চাপা পড়ে যায় অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অবশ্য এতে করে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় সহজেই। সহমর্মিতা দেখানোর লোকেরও অভাব হয় না। এতে করে নিজেকে অন্যায় বা পরিস্থিতির শিকার হিসেবে দেখিয়ে সহানুভূতি আদায় করা সহজ হয়ে গেছে অনেকের জন্য।

অসহায়ত্বের ভান ধরাটা ইদানিং সবার জন্য খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। সে গরিব হোক বা ধনী। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এবারই প্রথম এমন ঘটছে- যেখানে সমাজের প্রতিটা শ্রেণীর মানুষই নিজেকে পরিস্থিতির অসহায় শিকার মনে করে। নিজের মতবাদকেই শ্রেষ্ঠ ভেবে ঘৃণা পোষণ করে অন্যের প্রতি।

এখন দেখা যায়, যে কেউই অল্পতেই অপমানিত বোধ করে। সে যে ব্যাপারেই হোক না কেন। হয়তো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণবাদ সংক্রান্ত কোন বই পড়তে দেয়া হয়েছে কিংবা ক্রিসমাস ট্রি কোন এক শপিং মলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথবা ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে আধ শতাংশ ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। এমন সাধারণ কোন ঘটনাতেই মানুষ নিজেকে নির্যাতিত, নিপীড়িত ভাবা শুরু করে দেয়। তারও মনোযোগ পেতে হবেসবারকাছে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, এমনটা ভাবতে থাকে।

বর্তমানে মিডিয়ার ভূমিকা হয়ে গেছে এসব ঘটনাকে আরো উস্কে দেয়া। আরো বেশি মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। কারণ তাদের কাছে এটা ব্যবসার ধান্দা ছাড়া আর কিছুই না। প্রচারেই প্রসার হয় তাদের। লেখক রায়ান হলিডে একে নোংরামির অত্যাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। সত্যিকারের গুরুত্ববহ ঘটনা আর সমস্যাকে তুলে না ধরে এরকম তুচ্ছ ঘটনাকে বিশাল করে দেখাচ্ছে। কারণ এভাবে দেখানোটা খুব সহজ (লাভজনকও বটে)। দর্শকের কাছে এসব খবর ফুলিয়ে-ফাপিয়ে প্রদর্শন করায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে, সৃষ্টি হয় রোষানল। তারপর আবার সেই রোষানলের খবরকেই মুখরোচক করে দেখানো হয় আরেক দর্শকশ্রেণীকে। অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো ব্যাপারটা। একদিক থেকে আরেকদিকে আসা যাওয়া করে। এর ফলে চাপা পড়ে যায় সত্যিকারের সামাজিক সমস্যাগুলো।

এসব ভান ধরা মানুষের জন্য সত্যিকারের অন্যায়ের শিকার হওয়া মানুষ গুলোর খবর কারো কাছে পৌছে না। আসলে কে অবিচার আর অত্যাচারের শিকার আর কে নয়, সেটা নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের একসময় এই ব্যাপারটা নেশায় পরিণত হয়ে যায়। সবসময় নিজের মূল্যবোধ আর মতকে অন্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করাটা জেঁকে বসে মনে। প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট টিম ক্রেইডার ব্যাপারটাকে নিউ ইয়র্ক টাইমসে তুলে ধরে এভাবে-বিক্ষোভ প্রদর্শন ব্যাপারটা উপভোগ্য। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটা আমাদের কুরে কুরে খায়। অন্যসব অপরাধের তুলনায় এর মাত্রা আরো ভয়াবহ কারণ এটা যে আপনার রীতিমতো উপভোগ করি সেটা স্বীকারও করতে চাই না।

গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করতে হলে অনেক সময় পছন্দ না হলেও অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে মোকাবেলা করতে হয় আমাদের। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন সমাজে বাস করার মূল্য চুকানো বলা যায় একে। গণতন্ত্রে মূলকথা এটাই। একে অন্যকে পছন্দ না করলেও মেনে নিতে হয়। আর দিন দিন মানুষ এই কথাটা মনে রাখতে ভুলে যাচ্ছে।

আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র নিজেদেরই সতর্কতার সাথে বেছে নিতে হবে। সেইসাথে তথাকথিত শত্রুকেও বোঝার চেষ্টা করতে হবে।মিডিয়া এবং সংবাদকে কিছুটা সংশয় নিয়ে দেখতে হবে। এবং যাদের সাথে মতের মিল হচ্ছে না তাদের মুছে ফেলার প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

আমাদের উচিত সততা, স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ত্যাগ করা উচিত সবসময় আমিই ঠিক মনোভাব। বর্জন করা দরকার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছাকে, কিংবা বিপদেও হাসিমুখে থাকার অপ্রয়োজনীয় মূল্যবোধ পালন না করা। এসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধরে রাখাটা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে বর্তমান দুনিয়ায়। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব নেয়া শিখতে হবে, নিজেদের উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে। কে জানে, হয়তো আমাদের রাজনীতির ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে এরই মাঝে।

কীভাবে বলে কিছু নেই

অনেকেই এসব শুনে বলবে, ঠিক আছে। কিন্তু কীভাবে? মানলাম আমার বোধগুলো ফালতু এবং সমস্যাগুলা আমি এড়িয়ে চলছি। এবং আমি একজন আহাম্মক যে ভাবে, পৃথিবীরঘুরবে আমাকে কেন্দ্র করে। আমি কীভাবে বদলাব?

ইয়োডার মতো করে বলতে চাইহয়করো, না হয় কোরো না। এখানে কোন কীভাবে করতে হবে নেই।

আপনি প্রতিদিনই কোন বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে তা ঠিক করছেন। তো, বদলানোটাও খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

এটা খুবই সাধারণ একটা কাজ।তবে সহজ নয়।

সহজ নয় কারণ, প্রথম দিকে আপনার নিজেকে বিধ্বস্ত, অভাগা বলে মনে হবে। আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন। আপনার স্ত্রী এবং বন্ধু এমনকি বাবার সাথেও খারাপ ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো আপনার মূল্যবোধ পরিবর্তনের পার্শপ্রতিক্রিয়া।

সাধারণ হলেও বিষয়টা কঠিন। কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাজি ধরে বলা যায়, আপনি অস্থিরতায় ভুগবেন। আমার কি আসলেই এসব ত্যাগ করা উচিত? এটা কি ঠিক হচ্ছে?এত বছর ধরে যেভাবে চলেছেন তা ঝেড়ে ফেলা আসলেই কষ্টদায়ক, যেন আপনি ঠিক বেঠিক গুলিয়ে ফেলছেন।

এরপর আপনার নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে। জীবনের অর্ধেকটা সময় পুরাতন মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, মানদন্ডে চলার পর সেগুলো পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আপনার মাঝে একটা শূন্যতা তৈরি হবে। আপনার অনেক কাজ পূর্ববর্তী মূল্যবোধেরসাথে জড়িত ছিল। যখনই আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, যেমন, পার্টি করা থেকে পড়ালেখা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দাম জীবন ফেলে বিয়ে করে পরিবার গঠন করাটা জরুরী, আপনার সব কর্মকান্ডে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যাবে। খুবই অস্বস্তিদায়ক অনুভূতি হলেও, অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কষ্টকর হলেও, এ ধরনের পরিবর্তন জরুরী। গুরুত্ব বেছে সঠিক জায়গায় এম দিতে হবে। এতে করে আপনার শক্তির যথার্থ ব্যবহার হবে। আপনার মূল্যবোধে পরিবর্তন আনলে, ভিতর বাহির দুদিক থেকেই প্রতিবন্ধকতার শিকার হবেন। সবচেয়ে বড় কথা আপনি অনিশ্চয়তায় ভুগবেন, আসলেই ঠিক পথে আছেন কিনা। কিন্তু একসময় নিজেই বুঝতে পারবেন, এ ধরনের পরিবর্তন মঙ্গল বয়ে আনে।

অধ্যায় ৬

আপনি সব ব্যাপারেই ভুল (আমি নিজেও)

পাঁচশো বছর আগে মানচিত্রবিশেষজ্ঞরা ক্যালিফোর্নিয়াকে দ্বীপ ভাবতেন। ডাক্তাররা মনে করতেন রোগীর হাত কেটে রক্তাক্ত করে ফেললে তারা আরোগ্য লাভ করে।বিজ্ঞানীগণ মনে করতেন ফ্লোগিস্টন নামক বিশেষ বস্তুই আগুনের উৎস। মহিলারা ভাবতেন কুকুরের মূত্র মুখে মাখলে চেহারায় বয়সের ছাপ পড়বে না।জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতন, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে।

ছোটবেলায় আমি মিডিওকোরকে (ভালোও না, খারাপও না)এক ধরণের সবজি মনে করতাম। শাক সবজি খাওয়ার ইচ্ছেও আমার ছিল না। তারপর আমি ভাবতাম দাদীর বাসায় নিশ্চয়ই কোন সুড়ঙ্গ খুজে পেয়েছেআমার বড় ভাই। কেননা, সে বাথরুম থেকে সরাসরি বাড়ির বাইরে যেতে পারত। (আগে থেকেই বলে দিই,বাথরুমে একটা জানালা ছিল)। আমার বন্ধু তার পরিবারের সাথে ওয়াশিংটন বি.সি. তে ঘুরতে যায়। আমি ভেবেছিলাম সে কোনভাবে সময় পরিভ্রমণ করে ডাইনোসরের যুগ থেকে ঘুরে এসেছে। কারণ বি.সি. বলতে তো অনেক কাল আগের কথা বোঝায়।

কৈশোরে আমি কোন কিছুকে পাত্তা না দেয়ার ভাব ধরতাম। যদিও আমি অনেক বেশি চিন্তা করতাম সবকিছু নিয়ে। আমার অজান্তেই অন্য মানুষেরা আমার জগতে রাজত্বে করত। আমি ভাবতাম সুখ একসময় হাতে ধরা দেবেই। ভাবতাম ভালোবাসার জন্য কষ্ট করার দরকার নেই, ও জিনিস এমনিতেই আসে। আমার ধারণা ছিল বিশেষভাব ধরার জন্য চর্চা করা লাগে। নিজে থেকে বের করা যায় না, অন্যদের থেকে শিখতে হয়।

আমার প্রথম প্রেমিকার সাথে সম্পর্কের সময় আমি ভেবেছিলাম, আমরা চিরকাল একসাথেই থাকব। ওই সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর ভেবেছিলাম, অন্য নারীকে আমি এভাবে ভালোবাসতে পারব না। নতুন আরেকটি সম্পর্কে জড়িয়ে আমি বুঝলাম, অনেক সময় শুধু ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকেই তার নিজ প্রয়োজন নির্ধারণ করে। সেটাই ভালোবাসা, যেটাকে আপনি ভালাবাসা মনে করবেন, ধরাবাঁধা কোন রূপ নেই এর।

প্রতিটি পদক্ষেপেই আমি ভুল করেছিলাম। নিজেকে নিয়ে শুরু করে সমাজ, শিল্প, বিশ্ব, মহাবিশ্ব-সবকিছু নিয়েই।

আশা করেছিলাম, এভাবেই বাকি জীবন চলবে।

এখন যেভাবে আমি পূর্বের মার্কের ভুল-ত্রুটি ধরছি, একদিন হয়ত ভবিষ্যতের মার্ক হয়তো আমার বর্তমান সময়ের ভুল-ত্রুটি ধরবে। (এমনকি এই বইয়ের বিষয়বস্তুসহ)।আমি এতে খুশিই হবো। কারণ এতে বোঝা যাবে আমি আরো পরিণত হয়েছি।

ক্রমাগত ব্যর্থতা নিয়ে মাইকেলজর্ডানের বিখ্যাত উক্তি আছে। এ কারণেই তিনি এত সফল হয়েছেন। আমি অনেক ক্ষেত্রেই একের পর এক ভুল করেছি। এ কারণেই আমার জীবনে উন্নতি হচ্ছে, কমছে ভুলের মাত্রা।

বিকাশ একটা চলমান প্রক্রিয়া। নতুন কিছু জানতে পারলেই তা ভুল থেকে ঠিক হয়ে যায়না।ভুলথেকেএকটুকম ভুলের দিকে অগ্রসর হই। আমরা সবসময় সত্য এবং নিখুঁত এর পিছনে ছটে চলছি। কিন্তু তা অর্জন করা হয়ে উঠে না।

চূড়ান্ত সঠিক উত্তরের পেছনে ছুটে চলাটাইভুল। আমাদের বরং উচিত কিভাবে আজকেরভুল থেকে শিক্ষা নেয়া যায়। এই শিক্ষা আগামীতে আমাদের ভুল কমিয়ে আনবে।

এদিক থেকে দেখলে, ব্যক্তিগত উন্নতি একধরণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া । আমাদের মূল্যবোধ গুলো অনুমান, এই আচরণটা ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্য আচরণগুলো ভালো না, গুরুত্বপূর্ণও না। আমাদের কাজগুলোকে বলা যায় এক প্রকারের পরীক্ষা, যার ফলাফল হিসেবে আসা আবেগ আর চিন্তাধারাকে বলা যায় উপাত্ত।

সঠিক মতবাদ কিংবা নিখুঁত আদর্শ বলে কিছু নেই। আপনি অভিজ্ঞতার মাঝে শেখেন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। কিন্তু অনেকসময় অভিজ্ঞতাও আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। কারণ আপনার, আমার আর বাকি সবার চাহিদা এক না। একেকজনের ইতিহাস একেক রকম, একজনের জীবনের অবস্থা অন্যজনের চাইতে ভিন্ন। যার ফলেআমাদের জীবন ধারণ কীরকাম হওয়া উচিত সে প্রশ্নের উত্তরও ভিন্ন হবে ব্যক্তিভেদে। আমার উত্তর হবে, আমার মতে, সারা বছর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো উচিত, অচেনা-অজানা জায়গায় বাস করে দেখা উচিত, নিজের বায়ুত্যাগের শব্দে নিজেরই হেসে ফেলা উচিত। কিছুদিন আগ পর্যন্ত এরকমটাই মনে হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তরগুলো পাল্টে যাবে, বিকাশ ঘটবে। কারণ আমি নিজে পাল্টে যাচ্ছি, আমার বিকাশ ঘটছে। যতই বয়স বাড়ছে আর অভিজ্ঞতার ঝুলি বড় হচ্ছে, ততই বুঝতে পারছি আগে

কী ভুলই না ভাবতাম। এখন প্রতিদিন একটু একটু করে কম ভুল করছি আগের থেকে ।

অনেকেই তাদের জীবনকে এত বেশি পরিপূর্ণভাবে যে, তারা জীবন উপভোগই করতে পারে না।

একজন নিঃসঙ্গ মহিলা একাকীত্ব থেকে মুক্তির জন্য জীবন সঙ্গী চাইছে কিন্তু তিনি ঘর থেকেই বের হন না। তার অবস্থারও পরিবর্তন হয় না আরেকজন মানুষ পদোন্নতির আশায় রাতদিন খাটছেন, কিন্তু তিনি তার উর্ধ্বতনকে মুখ ফুটে বলতে পারছেন না।

তাদেরকে বলা হলো তারা ভুগছেন প্রত্যাখ্যাত হবার আশঙ্কায়, কারো মুখে না শোনার আতঙ্কে।

তবে এ কথাও সত্যি, প্রত্যাখ্যাত হলে মনে আঘাত লাগে। বিফল হলে সব কিছু বিষময় লাগে। কিন্তু আমাদের কিছু ভ্রান্ত নিশ্চয়তা বা প্রবল বিশ্বাস আছে যেগুলা আমরা আঁকড়ে ধরে রাখি। যেসব বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতেও ভয় পাই। আবার ছাড়তেও চাই না। ওই মহিলা বাসা থেকে বের হন না, ডেটিংও যান না। কারণ ডেটিংে যাওয়ার মানে হলো তার নিজের চাওয়া-পাওয়াকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। যে লোক হাড়ভাঙা খাটুনি দিচ্ছেন, তিনি পদোন্নতি চাইছেন না। কারণ সেটা চাওয়ার মানে তার নিজের যথেষ্ট দক্ষতা আছে কিনা আর পদোন্নতি পাবার যোগ্যতা আদৌ আছে কিনা, সেটার উত্তর দিতে হবে।

এরকম যন্ত্রণাদায়ক নিশ্চয়তার মধ্যে বাস করাটা সহজ আসলে। কেউ আপনাকে আকর্ষণীয় মনে করে না, আপনার প্রতিভার কদর কেউ বোঝে না, এরকম ভেবে নেয়াটা স্বস্তিদায়ক। সেগুলাকে পরীক্ষা করে দেখাটাই বরং কঠিন। আমি তো দেখতে ভালো না, তো এতো দেখাদেখির কী আছে, আমার বস আস্ত একটা ইতর। পদোন্নতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কী। এসব চিন্তাধারা আমাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে কিন্তু এতে বিসর্জন দিতে হয় ভবিষ্যতে সুখী হবার সুযোগকে। দীর্ঘ সময়ের কথা বিবেচনা করলে এই পদ্ধতি খুবই বাজে। কিন্তু তারপরেও এসব ছাড়তে পারি না আমরা। কারণ ভেবেই নিয়েছি যে আমরা যেটা ভাবছি সেটাই ঠিক। জানিই তো কী ঘটবে, গল্পের শেষটা কীভাবে হয়েছে আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছি।

নিশ্চয়তা বিকাশের শত্রু। কোন কিছুই নিশ্চিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা ঘটছে। আর ঘটলেও, সেটা তর্কের বাইরে যেতে পারবে না। আর ঠিক এই কারণেই আমাদের ত্রুটিযুক্ত মূল্যবোধকে মেনে নিতে হবে, যাতে সেগুলো বিকাশ ঘটার সুযোগ পায় ।

নিশ্চয়তার পিছনে ছোটার দরকার নেই। আমাদের দরকার সর্বদা সংশয়কে খোঁজা। নিজেদের বিশ্বাসকে সংশয় করা, আবেগকে প্রশ্ন করা উচিত। ভবিষ্যত আমাদের কাছ থেকে কী লুকিয়ে রেখেছে সেটা নিয়ে শুধু চিন্তা না করে সেটা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার দরকার। সবসময় ঠিক হওয়ার বাসনা থেকে সরে এসে জানা দরকার কী কারণে ভুল করে এসেছি সবসময়। কারণ আমরা ভুল করতেই অভ্যস্ত।

ভুল থেকেই পরিবর্তন আসে। তৈরি হয় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। এর মানে হলো নিজের না হাত কেটে আরোগ্য লাভ করা কিংবা বয়স কমানোর লক্ষ্যে মুখে কুকুরের মূত্র না ছিটানো। এর মানে ;মিডিওকোর কে সবজি মনে না করা, এর মানে হলো, চিন্তা করতে শেখা।

অদ্ভুত শোনালেও একটা সত্যি কথা বলি। আমরা আসলে জানিনা, কোন অভিজ্ঞত আমাদেও জন্য ইতিবাচক আর কোন অভিজ্ঞতা নেতিবাচক। অনেক সময় কষ্টের অভিজ্ঞতাও দেখা যায় পরিণত হয়েছে অনুপ্রেরণায়। উল্টোভাবে, অনেক অতি সুখের মুহূর্ত আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করে দিতে পারে, এমনকি হতাশাও ডেকে আনতে পারে। আপনার ইতিবাচক/নেতিবাচক ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন না। আমরা স্রেফ জানি, কোন ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আমাদের আঘাত করছে আর কোনটা করছে না। ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট।

পাঁচশো বছর আগের মানুষের জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করলে আমরা শিউর উঠি। আমার মনে হয়, এখন থেকে পাঁচশো বছর পরে মানুষ আমাদের কথা ভেবে হাসবে, আমাদের অতি নিশ্চয়তার কথা জেনে মজা করবে। আমরা প্রতিনিয়ত টাকা আর চাকরির চিন্তায় হন্যে হয়ে ছুটেছি-সেটার জন্যও হাসির পাত্র হবো আমরা। আমরা আপনজনদের কাছে টানার বদলে সেলিব্রেটিদের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতাম ভেবে মুচকি হাসবে। আমাদের সংস্কার আর কুসংস্কার, যুদ্ধ আর উদ্বিগ্নতার কথা জেনেও হেসে ফেলতে পারে। আমাদের নিষ্ঠুরতার ইতিহাস জেনে নাক কুঁচকে যফেলবে। আমাদের শিল্প নিয়ে গবেষণা করবে, ইতিহাস নিয়ে তর্ক জুড়বে। হয়তো আবিষ্কার করবে এমন এক সত্যের, যা আমরাই জানি না এখনো। আর তারাও ভুল করবে। কেবল আমাদের থেকে একটু কম করবে, এই যা

নিজের আত্মপ্রত্যয়ের নির্মাতা

ধরুন, কয়েকজন ব্যক্তিকে একটি রুমে এনে কিছু বাটন চাপতে দেওয়া হলে। তাদের বলা হলো, বিশেষ ধারায় বাটন চাপ দিলে আলো জ্বলে উঠবে এবং তাক একটি পয়েন্ট পাবে। আধ ঘণ্টায় কত পয়েন্ট পেলো তার হিসেব করতে দেওয়া হলো।

মনোবিদরা কাজটা করার পরে যা হওয়ার তাই হলো। সবাই বসে বসে এলোপাতাড়ি বাটন টিপতে লাগেগেলা। আর আচমকা আলো জ্বেলে উঠিলো। মানে তারা একটি পয়েন্ট পেলো। যুক্তিতি অনুযায়ী আগে যেসব বাটন চাপার পর আলো জ্বেলে উঠেছিল, সেগুলোই আবার চাপতে লাগল। কিন্তু এবার আর আলা জ্বলল না। এরপর নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো তাদের। কেউএকবার অমুক বাটন চাপছে তিনবার, তারপর তমুক বাটন একবার। এরপর পাঁচ সেকেন্ডের অপেক্ষা, তারপর ডিং করে একটা শব্দ! আরেক পয়েন্ট! কিন্তু এরপরে এই উপায়েও আর পয়েন্ট আসছে না। হয়তো বাটনের দোষ না, হয়তো আমার বসে থাকার ভঙ্গিতেই সমস্যা, তাই জ্বলছে না। কিংবা আমি ভুল কিছু ধরে ফেলেছিলাম। নাকি আমার পায়ের জন্য হচ্ছে এমনটা? ডিং! আরো একটি পয়েন্ট পাওয়া গেছে। যাক তারমানে, আমার পায়ের জন্যই পয়েন্ট পেয়েছি। এখন আরেকটা বাটন চাপি। ডিং!

দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে রুমের সবাই কোন না কোন পদ্ধতি বের করে ফেলেছে পয়েন্ট পাবার জন্য। সবগুলোই অদ্ভুতবলা যায়। যেমন একপায়ে খাড়া হয়ে থাকছে কেউ, আবার কেউ নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বাটন চেপেছে, কিংবা ঘরের একদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে যাতে আলো জ্বলে উঠে।

মজার ব্যাপার হলো, পয়েন্টগুলা একেবারেই খাপছাড়া। নির্দিষ্ট কোন ক্রমে জ্বলে না, কোন প্যাটার্নও নেই। স্রেফ ডিং! শব্দের সাথে জ্বলে উঠে এলোপাতাড়ি। অন্যদিকে সবাই ভাবছে তার বুদ্ধির জোরেই পয়েন্ট পেয়েছে।

রসিকতা বাদ দিই, এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের মন যে কত দ্রুত উদ্ভট ব্যাপার বিশ্বাস করে ফেলতে পারে, তা দেখানো। সবাই রীতিমতো দক্ষ এ ব্যাপারে। রুম থেকে বের হওয়ার সময় প্রত্যেকেই ভাবছে নিজের বুদ্ধির জোরে উতরে গেছে পরীক্ষায়, জিতে গেছে খেলায়। সবারই দৃঢ় বিশ্বাস, তার বের করা পদ্ধতিই সঠিক। প্রত্যেকের পদ্ধতিই আলাদা। এক লোক একগাদা বাটন চেপে গেছে তার মনমতো। ভাবছে সেটাই ঠিক। আরেক মেয়ের ধারণা হয়েছিল, সে সিলিঙে লাফিয়ে উঠে টোকা দিতে না পারলে পয়েন্ট অর্জন করতে পারবে না। রুম থেকে বের হওয়ার সময় হাঁপাচ্ছিল মেয়েটা, লাফালাফির ফল।

আমাদের মস্তিকের কাজই হলো, ব্যাখ্যা তৈরি করা। একাধিক অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে মস্তিষ্ক ব্যাখ্যা তৈরি করে। আমরা বাটন চাপার পরে দেখতে পাই আলো জ্বলে উঠেছে; আমরা ধরে নিই বাটনের কারণেই আলো জ্বলেছে। বাটন-আলো, আলো-বাটন। আমরা একটা চেয়ার দেখলাম। খেয়াল করলাম, চেয়ারটার রঙ ধূসর। মস্তিষ্ক সম্পর্কটা দাঁড় করায় এভাবে-রঙঃ ধূসর, বস্তুঃ চেয়ার। সুতরাং ব্যাখ্যা হলো, চেয়ারটা ধূসর।

আমাদের মস্তিষ্ক প্রতিনিয়ত ব্যাখ্যা তৈরি করে যাচ্ছে। যাতে আশেপাশের পরিবেশকে আমরা বুঝতে পারি, চাইলে নিয়ন্ত্রণও করতে পারি। এসবই হচ্ছে বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার ফসল। এমনকি এই পৃষ্ঠায় ছাপা সব লেখার কথাই ধরা যাক; ব্যকরণের জ্ঞান দ্বারাআপনি লেখার অর্থ বুঝতে পারছেন, ধূসর। আমার লেখা পড়ার পরে একঘেয়ে লাগলে মনে বিরূপ ধারণা তৈরি হচ্ছে। এই প্রত্যেকটা চিন্তা, ধারণা তৈরি হচ্ছে মস্তিস্কের স্নায়ুতে হাজার হাজার সম্পর্কের ফসল হিসেবে। মস্তিষ্ক ব্যাখ্যা তৈরি করে আপনাকে সরবরাহ করে যাচ্ছে। বিকাশ ঘটছে জ্ঞান আর উপলব্ধির।

কিন্তু এখানে দুটো সমস্যা আছে। এক, মস্তিষ্ক ত্রুটিহীন না। অনেক সময় আমরা যা দেখি বা শুনি তার ভুল অর্থ করি। ভুল বুঝি কিংবা অনেক কিছুই ভুলে যাই।

দুই, একবার ব্যাখ্যা তৈরি করে ফেললে মাথায় সেটা গেঁথে যায়। আর সেটাকে পরিবর্তন করারও কোন ইচ্ছে থাকে না আমাদের। বলতে গেলে গোঁ ধরে বসে থাকি। এমনকি মন গড়া ব্যাখ্যার উল্টো কোন অর্থ খুঁজে পেলেও দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যেতে চাই। কারণ, একবার যেটা বিশ্বাস করে ফেলেছি সেটাকে কেউই পাল্টাতে চাইনা।

কমেডিয়ান ইমো ফিলিপস বলেছিলেন, ;আমি আগে মনে করতাম আমার শরীরের সবচাইতে বিস্ময়কর অঙ্গ হচ্ছে মস্তিষ্ক। কিন্তু তারপরেই আমার মনে হলো, এ কথাটা আমাকে আসলে কে বলছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আমরা আসলে যা-ই জানি বা বিশ্বাস করি সেসব কিছুই হচ্ছে মস্তিস্কে একগাদা ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের সমারোহ। এছাড়া আর কিছুই না। অনেক দিনের চর্চা করা মূল্যবোধগুলোও আসলে ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে গড়ে উঠেছে। যেগুলা আদতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। অতীতে হওয়া অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে ভুল মূল্যবোধ গড়ে উঠাটাও অস্বাভাবিক কিছু না।

তো কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? আমাদের বেশিরভাগ বিশ্বাসই ভুল। স্পষ্ট করে বললে, সব বিশ্বাসই ভুল। একটা অন্যটা থেকে একটু হয়তো কম ভুল, কিন্তু ভুলই। কারণ মানুষের মন ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। এসব কথা শুনতে অস্বস্তি লাগতে পারে। কিন্তু এই ধারণাটা মেনে নেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমরা পরে বুঝতে পারবো।

বিশ্বাস করার ব্যাপারে সতর্ক হোন

১৯৮৮ সালে, থেরাপি নেয়ার সময় সাংবাদিক ও নারীবাদী লেখিকা মেরিডিঃ ম্যারান এক ভয়াবহ সত্য উপলব্ধি করেন। শিশু বেলায় তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতার দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন! ব্যাপারটা তাকে প্রচন্ড একটা ধাক্কা দিয়ে যায়। কিন্তু তার মনের গভীরে এই স্মৃতি চাপা পড়েছিল প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে, তিনি তার বাবার মুখোমুখি হন। পরিবারকে জানিয়ে দেন কী ঘটেছিল। ভয়ানক ঘটনার কথা শুনে গোটা পরিবার স্তব্ধ হয়ে যায়। শোনামাত্রই, এমন কিছুই ঘটেনি বলেনাকচ করে দেনমেরিডিথের বাবা। কেউ মেরিডিথের পক্ষ নিল আর কেউ তার বাবার। দু;ভাগে ভাগ হয়ে যায় পরিবারটি। মেরিডিথের সাথে তার বাবার সম্পর্কটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। অভিযোগ জানানোর পরেই এই যন্ত্রণা ছড়িয়ে যায় সবার মাঝে। দুমড়ে মুচড়ে যায় সবকিছু।

তারপর ১৯৯৬ সালে মেরিডিথ উপলব্ধি করেন, তার পিতা আসলে কখনোই তাকে যৌন নির্যাতন করেননি! আরেকজন থেরাপিস্টের সাহায্য তিনি সেই স্মৃতি উদ্ধার করেন। অনুতপ্ত হয়ে তিনি ক্ষমা চান তার পিতার কাছে, সেই সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছেও। যতদিন তার বাবা বেঁচে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু বড়ড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার বাবা মারা যান। এরপর থেকে তার সাথে পরিবারের সম্পর্ক কখনোই ঠিক হয়নি পুরোপুরি।

এরপরে দেখা যায়, শুধু মেরিডিথ না, আরো অনেকের সাথেই এমন ঘটনা ঘটেছে। তিনি তার আত্মজীবনী মাই লাইঃ আ ট্রু স্টোরি অফ ফলস মেমোরিতে লেখেন গোটা আশির দশকেই অনেক নারীই তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দিকে যৌন হয়রানির অভিযোগ জানিয়ে আঙুল তুলেছে। আশির দশকেই আবার, একদল লোক দাবি করে যে, একদল শয়তানের উপাসনাকারী শিশুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অবশ্য পুলিশবাহিনী বিভিন্ন শহরে তদন্ত চালিয়েও এমন কাজের কোন প্রমাণ খুঁজে পায়নি ।

তাহলে হঠাৎ করেই সবাই পরিবারের সদস্য কিংবা উপাসনাকারীদের বিরুদ্ধেএমন অভিযোগ জানাতে শুরু করলো কেন? কেন তা আশির দশকেই এমনটা হচ্ছিল?

ছোটবেলায় কখনো টেলিফোন গেম খেলেছেন? ঐযে, একজনের কানে কানে একটা কথা বললে সেটা আরো দশজনের কানে পৌছে যেত। আর শেষজন যখন কথাটা শোনে, তখন গোটা কথার অর্থই বদলে যেত? আমাদের স্মৃতিও ঠিক এভাবেই কাজ করে।

ধরা যাক, আমাদের নতুন কোন অভিজ্ঞতা হলো। এর কয়েকদিন পরে সেটা মনে করতে গেলে একটু ভিন্ন ভাবে মনে পড়ে। যেন কেউ ফিসফিস করেএকটা কথা বলল, পুরোপুরি বুঝতে পারলাম না শুনে কী বলেছে। তারপর সেই অভিজ্ঞতার কথা আরেকজনকে বলার সময় অনেক ফাক-ফোকর থেকে যায় মূল ঘটনার। আর সেই ফাক-ফোকর বন্ধ করার জন্য মনগড়া কিছু একটা বলে দিই ঘটনার সাথে তাল মিলিয়ে। যাতে গল্পের ধারা বজায় থাকে। এরপর সেই বানিয়ে বলা কথাকেই সত্যি ভেবে নিই নিজের অজান্তেই। কিন্তু সত্যি ভাবলেই তো আর সত্যি হয়ে গেল না, মূল অভিজ্ঞতার সাথে তো মিল আর থাকছে না। তারপর হয়তো বছর খানেক পরে মাতাল অবস্থায় সেই গল্প যখন বলতে যাই, আরেকটু রঙ চড়িয়ে দিই। যতটা না ঘটেছিল, তারচেয়ে বানানো অংশই বেশি থাকে তাতে। নেশা ছুটে গেলে যখন হুঁশ ফিরে আসে, তখন আর স্বীকার করি না যে মিথ্যে বলেছি। মাতাল অবস্থাতে বলা ঘটনাকেই সত্যি বলি মুখোশ খুলে যাবার ভয়ে। পাচ বছর পরেগল্প বলার সময় সেই বানানো ঘটনাও দেখা যায় পঞ্চাশ ভাগ মিলছে আর বাকি পঞ্চাশ মিলছে না।

আমরা সবাই এমনটাই করি। আপনি, আমি, সবাই। যতই সৎ থাকি না কেন ভিতঙে ভিতরে, আমাদেও অভ্যাসটাই এমনভাবে আমাদেও মন নিজে ভুল পথে চালিত হওয়া আর অন্যকে ভুল পথে পা বাড়ানোর জন্য প্ররোচনা করতে ওস্তাদ। কারণ আমাদেও মস্তিষ্ক তৈরিই হয়েছে এভাবে।

আমাদের স্মৃতিশক্তি ভয়াবহ রকমের জঘন্য। এতটাই জঘন্য যে কোন অপরাধের প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীকে এখন আর গুরুত্বই দেয়া হয়না। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলা যায়।

সেটা কীভাবে? সত্যি বললে, আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় বর্তমান অবস্থাকে ব্যাখ্যা করছে বিগত অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি তথ্যকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ আর সিদ্ধান্তের পাল্লায় মাপছে। যার ফলে, সেই সময়ে যে ব্যাপারটাকে সঠিক অনুভূত বলে হচ্ছে সেটার প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করে ফেলছে। মনে করা যায়, আমার বোনের সাথে আমার সম্পর্ক এখন চমৎকার চলছে। বোনের সম্পর্কে যত স্মৃতি আর ঘটনা মনে আছে সেসবকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছি। কিন্তু যখন সম্পর্ক তিক্ততায় গড়ায়, তখন সেই স্মৃতি আর ঘটনাগুলোকেই ভিন্নভাবে দেখা শুরু করে দিই বর্তমানের নাখোশ মনোভাবের সাথে তাল মিলিয়ে। ক্রিসমাসে দেয়া উপহারটা আর এখন পছন্দ হচ্ছে না। ক্রিসমাসের খুশিতে হয়ে না, সম্ভবত করুণার বশেই দিয়েছিল সেটা। মনে হবে তার লেক হাউজে আমন্ত্রণ জানাতে ভুলেনি, বরং ইচ্ছে করেই দাওয়াত দেয়নি।

মেরিডিথের মূল্যবোধ ঠিক কোন বিশ্বাসকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, সেটা বুঝতে পারলেই পরিষ্কার হবে কেন সে যৌন নির্যাতনের বানানো গপ্পো শুনিয়েছিল ।

প্রথমত, মেরিডিথের সাথ তার বাবার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না । দ্বিতীয়ত, মেরিডিথ বিভিন্ন পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়ালেও টেকে কোনটাই। এমনকি একবার বিয়েও হয়েছিল, কিন্তু ডিভোর্সে গড়ায় সেটাও।

সুতরাং তার মূল্যবোধ অনুযায়ী, পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুব একট ভালো যাচ্ছিল না।

আশির দশকের শুরুতে মেরিডিথ গোঁড়া নারীবাদের সমর্থকে পরিণত হন তিনি শিশু নির্যাতন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। জানতে পারেন একের পর এক শিশু নির্যাতনের ঘটনা। বছরের পর বছর ধরে কথা বলেন অজাচারের শিকার হওয়াদের সাথে। বিশেষত মেয়ে শিশুদের সাথে। তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট পেশ করেন। নির্যাতনের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো ছিল আগে থেকেই (এক রিপোর্ট অনুযায়ী, চার ভাগের তিন ভাগ নারীই শিশুবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল)।

এছাড়াও, মেরিডিথ আরেক নারীর প্রেমে পড়েন। সেই নারীও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল আপনজনের দ্বারা। শুরু হয় এক সম্পর্কের, যেখানে মেরিডিথ চাইছিলেন তার সঙ্গিনীকে ছোটবেলার ভয়াল স্মৃতি রক্ষা করতে। তার সঙ্গিনীও মেরিডিথের করুণা আদায় করে নেয় তার অতীতকে ব্যবহার করে (এ ব্যাপারে ৮ নাম্বার অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। এর মাঝে তার বাবার সাথে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে (মেরিডিথ সমকামী জানার পরে তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না)। মেরিডিথ ঘন ঘন থেরাপিতে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। তার থেরাপিস্টদের একেকজনের একেক মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের কথা অনুযায়ী মেরিডিথের বর্তমান অবস্থার জন্য তার চাকরি বা গবেষণা দায়ী নয়। এর পিছনে আরো গভীর কোন ঘটনা জড়িত আছে।

এদিকে নতুন এক ধরণের চিকিৎসার প্রচলন শুরু হয় সেসময়। যাকে রিপ্রেসড মেমোরি থেরাপি নাম দেয়া হয়। এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে বেশি সময় নেয়নি। এই পদ্ধতিতে, থেরাপিস্ট তার রোগীকে সম্মোহিত করেন। আর তাকে উপদেশ দেন ছোটবেলার ভুলে যাওয়া কোন স্মৃতির কথা মনের গভীর থেকে তুলে আনতে। পদ্ধতিটা অবশ্য মাঝে মাঝে কাজে দিত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, অল্প কয়েকটা হলেওকোন ভয়াবহ স্মৃতি খুজে পাওয়া।

বেচারি মেরিডিথ! সারাটাদিন কাটে শিশু নির্যাতন আর অজাচারের মতো বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে। বাবার বিরাগভাজন, কোন পুরুষের সাথেই তার সম্পর্ক টেকেনি বেশিদিন। একমাত্র এক নারীই তাকে বুঝতে পারে। সেই নারী আবার অজাচারের শিকার হয়েছিল। আহা! ওই তো থেরাপিস্টের কাউচে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে আর বলছে তার কী যেন একটা কথা মনে পড়ছে। কিন্তু বলতে

পারছে না, কারণ মনে আসছে না সেটা। ব্যস আর কী লাগে? যৌন নির্যাতনের বানোয়াট গপ্পো বানানোর মালমশলা তো সব মিলেই গেল।

কোন অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের মন চেষ্টা করে বিগত অভিজ্ঞতা, আবেগ আর বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেটাকে সাজানোর। কিন্তু আমরা প্রায়ই নতুন কোন ঘটনার বা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই, যার সাথে আগের কোন কিছুর মিল নেই। সেক্ষেত্রে নতুন সেই অভিজ্ঞতা পূর্বের অভিজ্ঞতাকে নাড়া দিয়ে যায় কারণ আমাদের জন্য এটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, যার সাথে আমরা পরিচিত না । তো মন তখন কী করে? সামঞ্জস্যতা রক্ষার জন্য মিথ্যে কিছু স্মৃতি তৈরি করে। বর্তমানে যা ঘটছে তার সাথে মিল রখে বানোয়াট অতীত দাঁড় করিয়ে ফেলে। যাতে বরাবরের মতো পূর্ব অভিজ্ঞতা, আবেগ আর বিশ্বাসের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

আগেই বলেছিলাম, মেরিডিথের কাহিনী নতুন কিছু না। আশি আর নব্বইয়ের দশকে শত শত নিরীহ মানুষকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে হয়রানি করা হয়েছে। যার জের ধরে অনেকে জেলও খেটেছে।

যাদের জীবনে সুখ বলে কিছু নেই, তাদেও মাঝে এই অপপ্রচার মহামারীর মতো ছড়িয়ে যায়। আপনিও নির্যাতনের শিকার হতে পারেন, এমন কথা শুনে তাদের মনের অজান্তেই নিজেকে আসলেই নির্যাতিত বলে মনে করা শুরু করে অনেকেই। যাতে নিজেকে পরিস্থিতির নিরীহ শিকার হিসেবে প্রমাণ করে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রিপ্রেসড মেমোরি থেরাপি বলতে গেলে অবচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবে রূপ দিত।

ব্যাপারটা এতটাই গুরুতর আকার ধারণ করে যে একে একটি নামও দিয়ে ফেলা হয়-ফলস মেমোরি সিনড্রোম। এ ঘটনার পর থেকে কোর্টরুমের সাক্ষীদের ভূমিকাও কমে আসে, হাজার হাজার থেরাপিস্টকে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়, অনেকের লাইসেন্সও বাতিল করে দেয়া হয়। রিপ্রেসড মেমোরি থেরাপি পদ্ধতি বাদ দেয়া হয়। তার বদলে আরো বাস্তবসম্মত, আরো কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি এক গবেষণায় বলা হয়েছে আমাদের বিশ্বাস সহজেই পাল্টাতে পারে, স্মৃতির উপর ভরসা করা যায় না মোটেই। আশি আর নব্বই দশকের ভুলটা যেন আরো| একবার চোখে আঙগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই গবেষণা।

রাস্তা ঘাটে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শোনা যায়। সবাই আপনাকে বলছে- নিজের উপর ভরসা রাখুন। মন যা বলে তাই করুন। শুনতে ভালোই লাগে কিন্তু এগুলো ছেঁদো কথা ছাড়া আর কিছুই না।

হয়তো আমাদের উচিত নিজেকে একটু কম হলেও বিশ্বাস করা। যদি আমাদের মন ভরসার যোগ্যই না হয় তেমনভাবে, আমাদের উচিত নিজেদের বিচার-বিবেচনাকে প্রশ্ন করা। আমরা যদি সবসময় ভুল করেই যাই তাহলে

আত্মসন্দেহ আর আত্মজিজ্ঞাসাই তো নিরাপদ রাস্তা। মানসিক ভাবে বেড়ে উঠার জন্য এটাই তো সঠিক উপায় হতে পারে, তাই না?

অতি নিশ্চয়তার বিপদ

এরিন সুশি রেস্টুরেন্টে আমার বিপরীতে বসে আছে। বলছে, কন সে মৃত্যুতে বিশ্বাস করে না। তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে। এর মাঝে চারটা শশার রোল পেটে চলান করেছে সে। একবোতল সাকে (ভাত থেকে তৈরি জাপানী ওয়াইন) গিলে মাতাল হয়ে আছে (দুনাম্বার বাতল খালি হবার পথে)। মঙ্গলবার, ঘড়িতে চারটা বাজে।

আমি ওকে এখানে আসার জন্য বলিনি। আমি কোথায় আছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পেরে চলে এসেছে।

আবারও।

এরিন আগেও এমনটা করেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার মৃত্যুকে জয় করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে এ-ও বিশ্বাস করে, এই কাজে তার আমার সহযোগিতা লাগবে। কিন্তু এই সাহায্য কান ব্যবসায়িক সহযোগিতার মতো না। সে যাদ ওযু আমার পরামর্শ-ও চাইত, তাহলেও কথা ছিল। কিন্তু না! এরিনের এরচেয়ে বোশি কিছু লাগবে। তার চাওয়া হচ্ছে আমি তার বয়ফ্রেন্ড হবো। কিন্তু কেন? দেড় ঘন্টাব্যাপী প্রশ্ন আর দেড় বোতল সাকে গেলার পরেও উত্তর পাইনি।

আমার বাগদত্তাও রেস্টুরেন্টে বসে ছিল আমাদের সাথেই। এয়শের ভাষ্যমতে, তারও আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী) সাথে আমাকে;ভাগাভাগি করে নিতে তার আপত্তি নেই, এ-ও জানিয়েছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এরিনের সাথে আমার ২০০৮ সালে দেখা হয়। একটা সেলফ হে সেমিনারে। প্রথম দেখায় ভালোই মনে হয়েছিল ওকে। একটু আধ্যাত্মিক আর পাগলাটে ধরণের যদিও। পেশায় উকিল, আইভি লিগ স্কুলেও গিয়েছে। বুদ্ধিমতিও বটে। আমার রসিকতা শুনে হাসতো, আমাকে কিউট ভাবতো। যা হওয়ার তাই হয়, আমি ওর সাথে বিছানায় যাই।

এক মাস পরে, ওর ক্যালিফোর্নিয়ার বাসায় উঠার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ খটকা লাগে। আস্তে করে পিছিয়ে যাই আমি। জবাবে এরিন জানায় যদি আমি ওর সাথে বাস করতে আপত্তি জানাই তাহলে আত্মহত্যা করবে। আরেক বিপদ! আমি দ্রুত ওকে ইমেইল, ফোনে যত জায়গায় সম্ভব; ব্লক করে দিই ।

এসব করে ওর পাগলামিকে অল্প সময়ের জন্য সামাল দেয়া গেলেও ভূমিকা আছে। গার্লফ্রেন্ডের (বর্তমানে একেবারে থামানো সম্ভব না।

আমার সাথে পরিচয় হওয়ার কয়েকবছর আগে এরিন গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় চলে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষা অনুযায়ী, আদতেই কয়েক মুহূর্তেও জন্য মারা গিয়েছিল। ওর মস্তিস্ক কাজ করা থামিয়ে দিয়েছিল অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বিস্ময়করভাবে বেঁচে ফিরে আসে। ফিরে আসার পর থেকেই দাবি করতে থাকে সবকিছু বদলে গেছে ওর। এখনও খুবই আধ্যাত্মিক একজন মানুষ। শক্তির দ্বারা আরোগ্য লাভ করা, দেবদূত আর ভাগ্য গণনাকারী কার্ডের মতো ব্যাপারে বিশ্বাস করতে শুরু করে। নিজেকে ভাবা শুরু করে এমন একজন আরোগ্যকারী, যার ভবিষ্যৎ দেখার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।কোন কারণে কে জানে, আমাকে দেখার পর থেকেই তার মনে হতে থাকে আমাদের দুজনের জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। ওর ভাষ্যানুযায়ী ‘মৃত্যুকে জয় করা।

ব্লক করার পরে এরিন একাধিক ইমেইল এড্রেস খোলে। প্রায়ই আমাকে ডজনেরও উপর বেশি মেইল পাঠাতে শুরু করে। তাও একদিনে। নকল ফেসবুক-টুইটার একাউন্ট খুলে আমাকে জ্বালাতে শুরু করে। আমার পরিচিত মানুষদেরও রেহাই দেয়নি। আমার দেখাদেখি একটা ওয়েবসাইটও খুলে বসে। আর একের পর এক আর্টিকেল লেখা শুরু করে। সেসব আর্টিকেলে দাবি জানায় আমি তার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড, তার সাথে প্রতারণা করেছি। তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়েছি। আমরা দুজন দুজনার। আমি ওর সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ করি সাইটটা বন্ধ করে দিতে। জবাবে এরিন জানায়, আমি যদি ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে ওর সাথে থাকা শুরু করি তবেই বন্ধ করবে।

এতো কিছুর পরেও ও নিজের কথাতেই অটল থাকে, আমার নিয়তিই লেখা আছে ওর সাথে। স্বয়ং ঈশ্বরের আদেশ। মাঝরাতে দেবদূতের কণ্ঠে ‘আমাদের বিশেষ সম্পর্ক’রব্যাপারে বাণী শুনে ওর ঘুম ভেঙেছে। পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূত আমরা দুজনে (ও আসলেই এগুলো বলেছে আমাকে)।

সুশি রেস্টুরেন্টেই এখনো বসে আছি আমরা। এর মাঝে কত হাজার ইমেইল এসেছে আমার নামে। উত্তর দিলেও আসতে থাকত, না দিলেও। ইমেইলের উত্তর কখনো নম্রভাবে দিতাম, কখনো ঝাঁঝালো সুরে। এত সময় চলে গেছে অথচ বদলায়নি কিছুই । ও নিজের উদ্ভট বিশ্বাস ছাড়েনি। পাক্কা সাত বছর ধরে এই এক কথাই বিশ্বাস করে আসছে (আরো কত বছর করবে কে জানে)

সময় গড়াচ্ছে। এরিন সাকে গিলছে আর হড়বড় করে শোনাচ্ছে কীভাবে তার পোষা বেড়ালের কিডনির পাথর সারিয়ে তুলেছে নিজের অলৌকিক শক্তির দ্বারা। ঠিক তখনই আমি উপলব্ধি করলাম, এরিন এমন এক মেয়ে, যে সর্বদা আত্ম-উন্নয়নের পেছনে ছুটছে। ব্যাপারটা ওর কাছে রীতিমতো নেশার পর্যায়ে চলে গেছে। বই, সেমিনার আর কোর্সের পিছনে হাজার হাজার ডলারখরচ করেও। অবাস্তব স্বপ্ন দেখে, আর সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়। ব্যর্থ হলেও

গা ঝাড়া দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে চেষ্টা শুরু করে। আর সবসময় ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। এখন তো দাবিই করে বসেছে বেড়ালকে বাঁচিয়ে তুলেছে। ঠিক যে ভাবে যীশু যেভাবে ল্যাজারাসকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। এরকম একটা দাবি করলেই হলো?

ওর মূল্যবোধের যে হাল, তাতে এসব কিছুই আসে যায় না। ও সব কিছু ঠিকভাবে করে, কিন্তু তার মানে এই না যে ওর সব কাজই ঠিক।

ওর মাঝে একধরণের নিশ্চয়তা আছে, ওর এই নিশ্চয়তা সহজে টলানো যায় না। ও অবশ্য নিজেই স্বীকার করেছে, ও যা ভাবে তা বেশিরভাগই উদ্ভট আর বিপজ্জনক। এরকম করার ফলে দুজনেই অস্বস্তিতে ভুগছি, তা-ও জানে। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে ওর মনে ধারণা হয়েছে যে এরকম করাটাই উচিত। ও চাইলেও বাদ দিতে পারবে না।

সময়টা তখন নব্বইয়ের মাঝামাঝি। মনোবিদ রয় বাউমাইয়েস্টার অশুভ শক্তির ধারণা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যারা খারাপ কাজ করে, কেনই বা তা করে—জানতে উঠে লেগে পড়েন।

প্রথম দিকে ধারণা করা হয় যারা নিজেদের নিয়ে হতাশায় ভোগে, তারাই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাদের মাঝে আত্মমর্যাদার অভাব থাকে। কিন্তু বাউমাইয়েস্টার অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন আসলে ব্যাপারটা তার ধারণার ঠিক উল্টো। ভয়ঙ্কর অপরাধীদের অনেকেই নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। সহজভাবে বললে, নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে মনে। বাস্তবে সেরকম না হলেও অন্যদের ক্ষতি করতে তাদের বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত বোধ করতো না শুধু এই কারণেই। অপরাধ যতই করুক, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তাদের কেউই পিছপা হতো না ।

অন্যের ক্ষতি করাকে যারা উচিত কাজ বলে মনে করে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের ভালোমন্দের বিচারে অটল ধারণা রেখে চলে। নিজেদের বিশ্বাসের উপর অসীম ভরসা থাকে। বর্ণবাদমূলক কাজ করে, কারণ সে নিজেকে উচ্চ আসনে কল্পনা করে বাকিদের চাইতে। ধর্মান্ধ ব্যক্তি আত্মঘাতী হামলা করে মানুষ খুন করে নিশ্চিন্তে কারণ সে মনে করে, পরকালে গিয়ে স্বর্গে শহীদের মর্যাদা পাবে। পুরুষরা ধর্ষণ করে নির্বিচারে, কারণ তারা নিশ্চিত-নারীর শরীরের উপর পুরুষের অধিকার জন্মগত।

খারাপ লোকেরা নিজেদের খারাপ ভাবে না; তারা উল্টো মনে করে, বাকি সব লোকেরাই খারাপ।

বিতর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা নাম আছে-মিলগ্রাম এক্সপেরিমেন্টস। প্রখ্যাত মনোবিদ স্ট্যান লিমিলগ্রামের নামানুসারে রাখা। সেরকম এক বিতর্কিত পরীক্ষায় গবেষকরা একদল ‘সাধারণ মানুষকে বলেন তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হলো অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদেও শাস্তি দেয়ার অধিকার। যদি তারা কোন প্রকারের

আইন অমান্য করে ফেলে তবে তাদের শাস্তি দেয়ার সুযোগ থাকবে। যেমন কথা তেমন কাজ, সেই 'সাধারণ মানুষরা সাধারণ কারণেই স্বেচ্ছাসেবীদের শাস্তি দিতে মোটেই কার্পণ্যবোধ করেনি। এমনকি শাস্ত্রীর মাত্রা শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাও কোন নির্দিষ্ট কারণ দেখানো ছাড়া, শাস্তির ব্যাখ্যা উল্টো,এই পরীক্ষায় তাদেরকে যে গুরু দেবার প্রয়োজনও মনে করেনি অনেকে। দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার ক্ষমতা বলেই শাস্তি দেবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে মনে করছে।

এখানে সমস্যা হচ্ছে, কখনোই নিশ্চয়তা অর্জন করা যায় না পুরোপুরিভাবে। বরং এই নিশ্চয়তার পেছনে ছোটার ফলে তৈরি হয় বাজে রকমের সংশয় বোধের।

প্রচুর সংখ্যক মানুষের নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে অতিনিশ্চয়তায় ভোগে। চাকরিতে তাদের কী পরিমাণ বেতন পাওয়া উচিত, সে ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত তারা। কারণ তাদের নিজেদের সামর্থ্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে। কিন্তু এই অতিনিশ্চয়তা তাদের আরো ক্ষতি করছে, ভালো করা তো দূরের কথা। অন্যরা পদোন্নতি পাচ্ছে আর সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ভাবছে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে, অবহেলা করা হচ্ছে। তাদের প্রাপ্য প্রশংসা আর পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আপনি যদি আপনার বয়ফ্রেন্ডের ইনবক্সে উঁকি দিয়ে কী লেখা আছে দেখতে চান,কিংবা বন্ধুকে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন অন্যরা আপনার ব্যাপারে কী বলছে, তাহলে আমি বলবো আপনি সংশয়ে ভুগছেন। নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছেন।

উঁকি দিয়ে নাহয় দেখলেনই বয়ফ্রেন্ডের ইনবক্সে কী মেসেজ আছে। পেলেন না তেমন কিছুই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে যাবে না। এরপর সন্দেহ করা শুরু করবেন তার আরেকটা মোবাইল আছে কিনা। নিজেকে প্রত্যাখ্যাত মনে করতে পারেন। অজুহাত দেখানো শুরু করতে পারেন কেন আপনাকে পদোন্নতি দেয়া হলো না। কিন্তু এতে ঘটনা খারাপের দিকেই মোড় নেবে। আপনি প্রমাণ করে দিচ্ছেন আপনার সহকর্মীদের বিশ্বাস করেন না। তাদের সব কথার অন্য অর্থ খুঁজতে শুরু করবেন একটা সময়। এরফলে আপনার পদোন্নতির শেষ আশাটুকুও নিভে যাবে। জীবনে 'বিশেষ একজন এর পেছনে ছুটে বেড়াতে পারেন। কিন্তু একেকটা নিঃসঙ্গ রাত কাটবে আর আপনি চিন্তা করতে থাকবেন জীবনে কী কী ভুল করেছেন, যার ফলে সেই বিশেষ একজনকে পাচ্ছেন না।

আপনি আসলে সংশয়ে ভুগছেন। প্রবল হতাশা ঘিরে ধরেছে আপনাকে। এমন সময় মনে হতে পারে একটু-আধটু প্রতারণা করাই যায় এ অবস্থায়। শাস্তি পাওয়াটা অন্যদের প্রাপ্যই, আমাদের ন্যায্য অধিকার পাবার সময় হয়েছে। দরকার হলে জোর করে হলেও অধিকার আদায় করা যায়।

ব্যাকওয়ার্ড ল’ আবার কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। আপনি যতই নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন ততই অনিশ্চয়তা আর সংশয়ে ভুগছেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, আপনি যখন থেকে অনিশ্চয়তার উপস্থিতিমেনে নেবেন, মেনে নেবেন আপনি কতটা কম জানেন ততটাই স্বস্তিবোধ করবেন।

অনিশ্চয়তা অন্যকে বিচার করার প্রবণতাকে কমিয়ে আনে। অপ্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণা আর পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। এমনকি নিজেকে বিচার করার প্রবণতা থেকেও সরে আসবেন। আমরা আসলে জানি না আমরা আদৌ ভালোবাসার যোগ্য কিনা, দেখতে সুদর্শন কিনা। কখনো সফল হতে পারবো কিনা তাও জানা নেই। ভালোবাসা কিংবা সফলতা পাবো কিনা, এসব জানার একমাত্র উপায় হলো তা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা। পেলাম কী পেলাম না সেটা পরের কথা।

অনিশ্চয়তাই উন্নতির চাবিকাঠি। কথায় আছে, যে মানুষ বিশ্বাস করে সে সব জানে সে কখনোই শিখতে পারে না। আমরা তখনই শিখব যখন কিছু জানব না। অজানাকে স্বীকার করে নিতে পারলে জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম হয়।

আমাদের মূল্যবোধ অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু মূল্যবোধকে নিখুঁত আর সম্পূর্ণ মনে করলেই বিপদ। সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় হলো আমাদের বিশ্বাস আর কৃতকর্ম সবই ভুল। যার ফলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

সত্যিকারের উন্নয়নের পথ খুঁজে পেতে চাইলে ভুল স্বীকার করা বাধ্যতামূলক।

মূল্যবোধ সংস্কার করার আগে, বর্তমান মূল্যবোধের সম্পর্কে নিশ্চয়তা ত্যাগ করতে হবে।সোজা কথায় বলতে গেলে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে, তাদেও খুঁত আর পক্ষপাতিত্বকে সাদা চোখে বিচার করার মানসিকতা গড়তে হবে। নিজেদেও অজ্ঞতাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার কওে নেয়া শিখতে হবে কারণ আমাদেও অজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যানসনের এড়িয়ে যাওয়ার সূত্র

আপনি হয়তোবা পারকিনসন্স ল’সম্পর্কে জেনে থাকবেন-‘কাজ ততটুকুই বৃদ্ধি পায় যতটুকু সময় হাতে থাকে তা শেষ করার জন্য।

আরমারফির ল সম্পর্কতো জানেনই——যদি কোন বিপদেও সম্ভাবনা থাকে, তবে তা ঘটবেই।

এরপরের বার যখন কোন ককটেল পার্টিতে গিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতে চাইবেন, ম্যানসনের এড়িয়ে যাওয়ার সূত্র প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। আপনার গোটা অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে, তেমন কিছুকে এড়িয়ে যেতে পারবেন।

ব্যাখ্যা করে বলি, আপনি নিজের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন আপনার মূল্যবোধ, সফলতার মাপকাঠি এসব কিছুকে যদি হুমকির সম্মুখীন হতে দেখে তাহলে সেই হুমকির মুখোমুখি না হয়ে সযত্নে এড়িয়ে যাবেন।

নিজের জায়গা কোথায় সেটা জানায় স্বস্তি আছে। কিন্তু যখন কোন কারণবশত সেই স্বস্তির জায়গাটা কেউ হুমকির মুখে ফেলে দেয়, তখন আপনি সেই অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চাইবেন। এমনকি তাতে যদি আপনার উপকারও হয়, তা-ও আপনি এড়িয়েই যাবেন। অজানাকে জানার চাইতে না জানাতেই স্বস্তি। কারণ সেখানে কোন ভয় নেই, ঝুঁকি নেই।

ম্যানসনের সূত্র জীবনের ভালোমন্দ উভয় ব্যাপারেই প্রয়োগ করা যায়। এক মিলিয়ন ডলার জেতার মানে আপনার টাকা হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে গেছে, বিখ্যাত রকস্টার হবার অসুবিধে হলো, আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। এই জন্যই মানুষ সফলতাকে ভয় পায়। ঠিক এভাবেই তারা ব্যর্থ হতেও ভয় পায়। বর্তমানের আমিকে ছেড়ে আসার ভয়।

আপনি অনেক দিনের স্বপ্ন-একটা চিত্রনাট্য লিখবেন, কিন্তু লিখছেন না। কারণ, লিখলে আপনার ইনস্যুরেন্সের চাকরিটার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে যাবে। আপনি আপনার স্বামীকে মুখ ফুটে বলতে পারছেন না যে বিছানায় আপনি আরো উত্তেজনাময় কিছু চান। বললেই নম্র-ভদ্র নারীর মুখোশটা খুলে যেতে পারে। বন্ধুত্ব রাখতে চাইছেন না আবার তাকে ছেড়েও দিতে পারছেন না, দিলে আপনার আর ভালো মানুষীটা, দয়ালু ভাবটা যে আর থাকবে না। এসব হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। কিন্তু সর্বদা এই সুযোগগুলোই হাতছাড়া করি আমরা। কারণ সুযোগগুলো নেয়ার মানে তথাকথিত ধারণার বাইরে গিয়ে কাজ করা হবে। এতদিনের গড়ে উঠা মূল্যবোধ আর অভ্যাসের কোন দামই থাকছে না।

আমার এক বন্ধু ছিল। সে অনেক দিন ধরেই বলে আসছে তার আঁকা ছবি ইন্টারনেটে বিক্রি করবে। পেশাদার আর্টিস্ট হবার স্বপ্ন ছিল। বছরের পর বছর বলে গেছে, টাকা জমিয়েছে বেশ কিছু, কয়েকটা ওয়েবসাইটও বানিয়েছে। তারপর সেখানে নিজের পোর্টফোলিও আপলোড করেছে।

কিন্তু কখনোই ব্যবসাটা চালু করেনি। কোন একটা কারণে হয়তো করেনি। হয়তো নিজের কাজের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিল না, অধ্যবসায় ছিল না। পোর্টফোলিও আপলোড করার পরেহয়তো আরেকটা ভালো ছবি এঁকেছিল। কিংবা হাতে সময় ছিল না এসব করার জন্য।

এভাবে অনেক বছর কেটে গেছে। আর সে-ও আসল চাকরি ছাড়েনি। কেন? ছবি আঁকাকে পেশা হিসেবে নেবার স্বপ্ন দেখলেও ঝুঁকি ছিল। কারণ সবার অপছন্দের শিল্পী হওয়ার চাইতে অচেনা এক শিল্পী হওয়া অনেক স্বস্তিদায়ক ছিল

তার জন্য। এতে তার সম্ভবত কোন আপত্তিও ছিল না। না-হ বা জানুক কেউ তার ছবির কথা, অন্তত ঘৃণা তো আর করছে না!

আমার আরেকজন বন্ধু ছিল। ফুর্তিবাজ একজন মানুষ। সবসময় মদ গিলছে মেয়েদের পিছনে ছুটছে। বহু বছর উদ্দাম জীবন যাপন করার পরে হঠাৎ করে নিজেকে বড্ড একলা আবিষ্কার করে। হতাশায় ভেঙে পড়ে, স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যায়। চাইছিল আগের উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারাকে ছেড়ে আসতে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমরা যারা মোটামুটি একটা শান্ত জীবন যাপন করছি তাদের সাথে বাজে ব্যবহার করা শুরু করে। ঈর্ষায় পুড়তে থাকে, কারণ তার চেয়ে আমরা ভালো অবস্থানে আছি। কিন্তু এরপরেও বদলাতে পারেনি। বহুদিন ধরে একই কাজ করে গেছে। বোতলের পর বোতল মদ পেটে পড়েছে, রাতের পর রাত একাকী থেকেছে। সবসময় অজুহাত দেখাতো এসব করে যাওয়ার পক্ষে।

তার এই বুনো জীবন ছেড়ে আসার মানে তার অস্তিত্বকে হুমকিতে ঠেলে দেয়া। সে কেবল ফুর্তি করতে জানতো। সেটা ত্যাগ করা তার জন্য আত্মহত্যার সামিল।

আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মূল্যবোধ আছে। আমরা সেই মূল্যবোধকে রক্ষা করে চলি। সে অনুসারে জীবন যাপন করি আর সবকিছুকে সেটার দ্বারাই বিচার করতে চাই। মানতে না চাইলেও কথা সত্য। আমাদের মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে। আগেই বলেছি, আমরা যেসব ব্যাপারে অবগত সেসব ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করি। কোন ব্যাপারে নিশ্চিত আছি। এর মানে আমার কাছে সেটাই সত্যি। যদি আমি বিশ্বাস করি আমি একজন ভালো মানুষ, তাহলে আমি সবসময় সেই সব পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলবো, যেখানে ভালোমানুষীটা রক্ষা না- ও করতে পারি। নিজেকে দক্ষ রাঁধুনি ভাবি, নিজের কাছেই নিজেকে প্রমাণ করতে থাকবো যে আমি আসলেই ভালো রাঁধতে পারি। বিশ্বাসের অগ্রাধিকার সবকিছুতেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্তি পাবো না, উদ্বিগ্নতা থেকে বাঁচতে পারবো না। নিজেকে বদলাতে পারবো না।

এ অবস্থায় 'নিজেকে জানা' কিংবা 'নিজেকে খুঁজে পাওয়া' উল্টো বিপদজনক হতে পারে আপনার জন্য। কারণ এতে নিজের সম্পর্কে অনড় ধারণা তৈরি হয়ে যেতে পারে, উচ্চাভিলাষীতে পরিণত হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। এতে উন্নয়নের সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে যেতে পারে আপনার জন্য।

আমি বলবো, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার দরকারই নেই। নিজেকে জানার প্রয়োজনও দেখি না। কারণ, এতে আপনি এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাবেন। অজানাকে জানার অভিপ্রায়ে পথ চলতে পারবেন। নম্র হতে শিখবেন, অন্যের ভুলত্রুটি মেনে নিতে পারবেন।

নিজেকে বদলে ফেলুন

বৌদ্ধধর্মমতে 'আমিত্ব-এর ধারণা অযৌক্তিক মানসিক চিন্তা। এবং প্রত্যেকের উচিত এই আমিত্ব;-এর চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলা। নিজেকে মানদণ্ডে দাঁড় করানোটাই বরং আপনাকে আটকে ফেলছে। সবকিছুকে এড়িয়ে গেলেই আপনি ভারমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এক অর্থে বলতে গেলে বৌদ্ধ ধর্ম আপনাকে হতাশাকে না বলার মন্ত্র শেখাচ্ছে।

শুনতে পাগলের বুলি লাগতে পারে। কিন্তু এতে মানসিকভাবে উপকারও হচ্ছে। যখন নিজেকে বড় কিছু মনে করা থামিয়ে দেবেন, তখনই উন্নতির চাবি হাতে পেয়ে যাবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থও হতে পারেন কিন্তু প্রকৃত বিকাশ এখানেই নিহিত।

কেউ যখন নিজের কাছে স্বীকার করে 'আমি সম্পর্ক রাখতে জানি না তারপরই সে স্বাধীনভাবে তার অসুখী বিবাহিত জীবনে ইতি টানতে পারে। তার এখন কোন দরকার নেই নিজের স্ত্রীঅস্তিত্বকে রক্ষা করার। নিজেকে ভালো একজন ঘরণী প্রমাণ করার জন্য এমন অসুখী জীবন যাপন করার প্রয়োজন নেই আর।

যখন একজন ছাত্র নিজেকে বলতে পারে, আমি বিদ্রোহী নই, আমি হয়তো একটু ভয় পাচ্ছিতখন সে আবারও উচ্চাভিলাষী হতে পারবে। তার এখন ভয়ের কিছুই নেই। শিক্ষাগত কোন লক্ষ্য পূরণের পিছনে ছুটে ব্যর্থ হওয়ারও আশঙ্কা নেই।

ইনস্যুরেন্সে চাকুরিরত লোকটা যখন ঘোষণা দেয়, 'আমার স্বপ্ন কিংবা চাকরি কোনটাই বিশেষ কিছু না,তখনই সে চিত্রনাট্যটা লিখে ফেলার সাহস অর্জন করে ফেলে।

আপনার জন্য একটা ভালো আরেকটা খারাপ খবর আছে আমার কাছে। আপনার সমস্যাতে বিশেষ কোন ব্যাপার লুকিয়ে নেই। আর এ জন্যই সেসব সমস্যা ঝেড়ে ফেললে নিজেকে স্বাধীন মনে হয়।

যখন আমি মনে মনে কল্পনা করতে থাকেন আপনার প্লেনটাই আজকে ক্র্যাশ করবে, আপনার প্রজেক্টের আইডিয়া নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে কিংবা আপনাকে লক্ষ্য করে রসিকতা ছুঁড়ে দেয়া হয়অথবা স্রেফ আপনার উপস্থিতিকেই উপেক্ষা করা হয়- তাহলে আপনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন, আমি সবার থেকে আলাদা, অন্য কেউই আমার মতো না; আমি ভিন্ন বাকিদের চাইতে।

এটা নার্সিসিজম ছাড়া আর কিছু না। আপনার মনে হচ্ছে, আপনার সমস্যাকে আলাদা গুরুত্ব দেয়া উচিত, অন্যদের চেয়ে আপনার সমস্যাটাই বেশি জটিল। দুনিয়ার আর কারো এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি।

আমার পরামর্শ, এত আলাদা কিছু হওয়ার দরকার নেই, বিশেষ একজন হতে হবে না। নিজের মানদন্ডকে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করুন। নিজেকে। ভবিষ্যতের সুপারস্টার মনে করার দরকার নেই, জিনিয়াস ভাবাটাও অযৌক্তিক। হবে। পরিস্থিতির শিকার ভাবলে চলবে না, ব্যর্থ ভাবাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার চেয়ে বরং নিজেকে খুব সাধারণ ভাবতে শিখুন। সেটা একজন ছাত্র হতে পারে কিংবা কারো সঙ্গী/বন্ধু, এমন কেউ যে নতুন কিছু তৈরি করতে জানে।

নিজেকে সহজ আর সাধারণ ভাবার সুবিধা হলো, এতে আপনার অস্তিত্বকে হুমকি মুখে পড়তে হবে না।

এই কথার অর্থ হলো, নিজেকে বিশাল ভাবার প্রবণতা বন্ধ করা। যেমন- আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী, সর্বগুণে গুণান্বিত, দেখতে অসম্ভাব সুদর্শন কিংবা ভয়াবহ রকমের নিগৃহের বলি মাত্র; পুরো দুনিয়া অজানা কারণে আপনার কাছে ঋণী হয়ে আছে। এসব অভ্যাস বাদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে অতি কল্পনা বিসর্জন দেয়া, অতি আবেগের রাশ টেনে ধরা। ব্যাপারটা অনেকটা নেশাখোরকে বলা ইঞ্জেকশন না নিতে। আপনার প্রচন্ড কষ্ট হবে বাদ দিতে। কিন্তু একবার বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলেই আপনি রূপান্তরিত হবে অন্য এক মানুষে।

কীভাবে নিজের সামর্থ্যকে প্রশ্ন করবেন

নিজের বিশ্বাস এবং চিন্তাধারাকে প্রশ্ন করার দক্ষতা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তা অর্জন করা সম্ভব। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মাধ্যমেই তা পারবেন-

প্রশ্ন#১ আমি যদি ভুল করি, তাহলে?

কদিন আগে আমার এক বান্ধবীর বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। ওর বাগদত্ত মানুষ হিসেবে ভালোই। মদ্যপান করে না। ওর সাথে বাজে ব্যবহারও করে না। লোকটি মিশুক প্রকৃতির এবং ভালো একটা চাকরিও করছে।

কিন্তু বাগদানের পর থেকেই, বান্ধবীর ভাই ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনবরত অনুযোগ করে যাচ্ছে। তার মতে, বান্ধবী দায়িত্বহীনের মতো কাজ করছে এবং এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের কারণে ওকে পস্তাতে হবে। যখনই বান্ধবী ওর ভাইকে জিজ্ঞেস করে, “তোমার সমস্যাটা কি? তোমার এত জ্বলছে কেন?সে এমন একটা ভাব করে, যেন তার কিছুই আসে যায় না। সে শুধু তার ছোট বোনটাকে সাহায্য করতে চাচ্ছে।

কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, এ ব্যাপারে তার সমস্যা হচ্ছে। হতে পারে, বিয়ে নিয়ে তার নিজের অনিশ্চয়তাপূর্ণ মনোভাব। হতে পারে, ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব। হিংসে থেকেও হতে পারে। এমনও হতে পারে, তার নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য অন্যের সুখ সহ্য করতে পারে না। অন্যকে সুখী হতে দেখলে প্রথমে তাদের কিছু কষ্ট দিতে চায় সে।

সাধারণ নিয়মানুসারে, পৃথিবীতে আমরা নিজেদের পর্যবেক্ষণেরব্যাপারে জঘন্য। আমরা যখন রেগে যাই বা হিংসা করি অথবা হতাশায় থাকি, আমরাই হয়তো সবার পরে তা বুঝতে পারি। সেটা বোঝার জন্য দরকার হলো ক্রমাগত নিজেদের অতি নিশ্চয়তার বর্মে ফাটল খুঁজে বের করা। নিজেদের ব্যাপারে ভুল হতে পারি কিনা সে ব্যাপারে নিজেকে নিজের প্রশ্ন করা উচিত।

'আমি কি ঈর্ষান্বিত? হয়েও যদি থাকিতবে কেন?"আমি কি রেগে আছি?"সে কি সঠিক? আমি কি শুধু আমার অহমকে রক্ষা করছি?'

এসব প্রশ্নকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই, নিজেকে প্রশ্ন করার এই সাধারণ কাজই আমাদের নম্র করে তোলে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আপনার ধারণা ভুল কিনা এই জিজ্ঞাসা করা মানে এই নয় যে, আপনি ভুল পথে আছেন। রান্না করতে গিয়ে মাংস পুড়িয়ে ফেলায় আপনার স্বামী আপনাকে বেদম প্রহার করলো। এবং আপনি ভাবছেন, স্বামী আপনার সাথে বাজে ব্যবহার করেন—এই ধারণা হয়তোবা সঠিক নয়। মাঝে মাঝে আপনি ঠিকও হতে পারেন। মূল উদ্দেশ্য হলো, শুধুমাত্র প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে সাথে সাথে চিন্তা করা, নিজেকে ঘৃণা করা নয়।

মনে রাখবেন, আপনার জীবনে তখনই পরিবর্তন আসবে, যদি আপনি কোন বিষয়ে ভুল করে থাকেন। আপনি ভগ্ন হৃদয়ে দিনের পর দিন বসে আছেন, তার মানে আপনার জীবনে অবশ্যই কোন বড় ঘটনা ঘটে গেছে। নিজেকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করার সক্ষমতা অর্জনের আগ পর্যন্ত কোন ফলই আসবে না।

প্রশ্ন#২ **আমি যদি ভুল করেই থাকি, তাহলে এর মানে কী দাঁড়াল?**

ভুল পথে চলছে কিনা, এ প্রশ্ন নিজেকে অনেকেই করতে পারে। কিন্তু অল্প সংখ্যক মানুষই পারে, পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে। এবং যদি তারা ভুল করে থাকে তবে তার ফলাফল কি হবে স্বীকার করে নিতে পারে। কারণ, আমাদের ভুলের সম্ভাব্য কারণটা প্রায়ই বেদনাদায়ক। এটাশুধু আমাদের মূল্যবোধকেপ্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয় না, দেখিয়ে দিতে পারে ভিন্ন বা বিপরীতধর্মী মূল্যবোধ আসলে কিরকম হতে পারে।

এরিস্টটল লিখেছিলেন, সব মত গ্রহন করতে না পারলেও বিবেচনা করা শিক্ষিত লোকের লক্ষণ। ভিন্নধর্মী মতবাদ গ্রহণ না করেও সেখান থেকেও শিক্ষা

নেয়া যায়। এটা জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনার জন্য খুবই দরকারি একটা কৌশল ।

আমার বান্ধবীর ভাইয়ের নিজেকে যে প্রশ্ন করা উচিত তা হলো-বোনের বিয়ে নিয়ে যদি আমার ধারণা ঠিক না হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর সাধারণতসোজাসাপ্টাই হয়। (এরমধ্যে বেশিরভাগই;আমি স্বার্থপরের মতো আচরণ করছি/সন্দেহে ভুগছি/নার্সিসিস্টদের মতো ব্যবহার করছি- জাতীয় উত্তর হয়) যদি সে ভুল হয়ে থাকে, এবং তার বোনের বাগদান ঠিকঠাকভাবে চলতে থাকে তবে এটা একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। তা হলো নিজের সংশয় মনোভাব। সে ধরেই নিয়েছে, বোনের জন্য ভালো তার থেকে বেশি কেউ বোঝে না। এবং তার বোন জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না;বড় সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার দায়িত্ব তারই; সে খুবই নিশ্চিত, সে-ই সঠিক এবং বাকি সবাই ভুল।

এধরণের আচরণের কারণ উন্মোচিত হয়ে যাবার পরেও স্বীকার করা নেয়াটা কঠিন। সেটা আমার বান্ধবীর ভাইয়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা আমাদের নিজের ক্ষেত্রে। এ কারণেই কমসংখ্যক লোক নিজের দিকে কঠিন প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন করা ব্যতীত এই উদ্ধত আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল।

প্রশ্ন #৩ **ভুল হলে কি আমার কিংবা অন্যদের জন্যসমস্যা আরো বাড়বে না কমবে?**

আমাদের মূল্যবোধ ঠিকঠাক আছে কিনা নাকি আমরা সবার সাথে উন্মাদের মতো আচরণ করছি তা ব্যাখ্যা করার জন্য লিটমাস টেস্ট চালানো যাক।

এখানে উদ্দেশ্য হলো, তুলনামূলক ভাবেকোন সমস্যাটা 'ভালো' তা খুঁজে বের করা। কারণ, নিরাশকারীপান্ডা বলেছিল, জীবন অসীম সমস্যায় পূর্ণ।

আমার বান্ধবীর ভাই, কোনটি বেছে নিতে পারে?

ক. নাটক অব্যাহত রেখে পরিবারে ফাটল ধরানো। একটা আনন্দের সময়কে জটিল পরিস্থিতিতে পরিণত করা। এবং তার বোনের কাছ থেকে যে সম্মান এবং বিশ্বাস পেতো তা নষ্ট করা। কারণ তার মন বলছে, (অনেকে আবার একে অন্তজ্ঞান বলতে পারেন) এই লোকটি তার বোনের জন্য ভালো হবে না।

খ. নিজের ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করা। বোনের বড় সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখা। আর তা-ওকরতে না পারলে, ফলাফল যা-ই আসুক না কেন তার বোনের প্রতি ভালোবাসা আর সম্মানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অবস্থাকে মেনে নেয়া।

বেশিরভাগ লোক প্রথমটিকে বেছে নিবে। কারণ প্রথমটিই সহজ পথ। এর জন্য বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই, দ্বিতীয় চিন্তা করতে হয় না

অন্যের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা যায়। এতে করে আশপাশের লোকজনও অহেতুক ঝামেলার শিকার হয়।

দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেই বিশ্বাস এবং সম্মানের সাথে সুস্থ এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব। এ পথ মানুষকে নম্র এবং অজ্ঞতা স্বীকারে বাধ্য করে। নিজের সংশয়কে পাশ কাটিয়ে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে,

কিন্তু এই পথ কঠিন এবং কষ্টদায়ক। তাই মানুষ তা অনুসরণ করতে চায় না।

বান্ধবীর ভাই, বাগদানের বিরোধিতা করে, নিজের সাথেই অলিখিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। অবশ্যইসে বোনকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি, বিশ্বাস যুক্তিনির্ভর নয়। নিজেদের তৈরি করা মূল্যবোধ আর বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর। সত্যি কথা হলো, নিজেকে ভুল ভাবার থেকে সে বোনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করতেও প্রস্তুত। অথচ দ্বিতীয় পথ বেছে নিলে সে নিজের সংশয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো।

গত কয়েক বছর ধরে আমি কিছু নিয়ম মেনে চলি। যদি কোন পরিস্থিতিতে আমি গোলমাল পাকিয়ে থাকি, অথবা বাকি সবাই গোলমালপাকাচ্ছে, তবে বেশি সম্ভাবনা হলো,আমিই গোলমাল পাকিয়েছি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা শিখেছি। বহুবার নিজের ত্রুটিপূর্ণ নিশ্চয়তা আর সংশয় মনোভাবের কারণে বোকার মতো আচরণ করেছি। ব্যাপারটা সুখকর না মোটেও।

বলছি না যে, অনেকগুলো মানুষ কখনোই ভুল করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এমন কোন সময় আসবে না যখন অনেকে ভুল করবে আর একমাত্র আপনিই ঠিক থাকবেন ।

ব্যাপারটা আসলে খুব সহজ। যখন মনে হবে আপনি পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তখন আসলে আপনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

অধ্যায় ৭

ব্যর্থতাই আগে বাড়তে শেখায়

সত্যি কথা বলতে, আমার কপাল ভালো ছিল।

আমি ২০০৭ সালে কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করি। সে সময়টাতে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে এবং মহামন্দা শুরু হয়। ৮০ বছরের মধ্যে চাকরির বাজার যখন সবচেয়ে বাজে,তখন বাজারে ঢোকার চেষ্টা করতে হলো।

একইসময় আমি আবিষ্কার করলাম আমার অ্যাপার্টমেন্টের অন্য আরেকটি রুম ব্যবহার করা ব্যক্তি তিন মাস ধরে ভাড়া পরিশোধ করেনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। আমার রুমমেট এবং আমার উপর সব চেপে বসল। টাকা যা জমিয়ে ছিলাম, সব শেষ। পরের ছয় মাস এক বন্ধুর সোফায় থাকতে হয়েছে। ছোটখাটো কাজ করে যতটা সম্ভব ধার- দেনা কমিয়ে রাখতে হয়েছে।

কপাল ভালো ছিল বলছি কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময়ই আমি চালচুলোহীন ছিলাম। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছিল আমাকে। আর মানুষের ভয়টা থাকে সেখানেই। নতুন ব্যবসা শুরু করার আগে কিংবা পেশা বদলের সময় অথবা চাকরি ছেড়ে আসার প্রাক্কালে। সেখানে আমি শূন্য থেকেই শুরু করেছিলাম। এরচেয়ে খারাপ হওয়ার তো আর ভয় নেই।

কপাল তো ভালোই বলা যায়। নোংরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে পয়সা গুনছেন এই সপ্তাহে খাবার জোগাড় করার মতো যথেষ্ট টাকা আছে কিনা, গোটা বিশেক সিভি পাঠিয়েও ডাক পাননি। এরপর শুরু করলেন ব্লগ লেখা আর ইন্টারনেটের ব্যবসা, খুব খারাপ তো কিছু না। এমনও যদি হয়, যে আমি যে ব্যবসাতেই হাত দিই না কেন, যত সিভিই পাঠাই না কেন, সেসব যদি ফলপ্রসূ নাও হয়, তারপরেও আমি সেই শূন্যতেই থেকে যাব। ক্ষতি তো আর হচ্ছে না। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী তাহলে?

ব্যর্থতা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। যদি আমি মনে করি, আমার লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট বিদ্রোহী হওয়া, তাহলে ২০০৭ আর ২০০৮ সাল জুড়ে অর্থের অভাবে ভুগলেও বলতে পারবো আমার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলাম। আর যদি বলি, বাকি সবার মতো আমারও লক্ষ্য ছিলো সাধারণ একটা চাকরি পাওয়া

যেখান থেকে বিল মেটানোর মতো টাকা আসে, তাহলে আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলাম লক্ষ্য অর্জনে ।

আমি একটা সচ্ছল পরিবারে বেড়ে উঠেছি। টাকাপয়সা কখনো সমস্যা ছিল না। অন্যদিকে, আমি একটা সচ্ছল পরিবারে বেড়ে উঠেছি যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থ দিয়ে সমস্যা সমাধানের থেকে এড়িয়ে যাওয়া হতো। এদিক দিয়েও আমি ভাগ্যবান, কারণ ছোট বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম যেঅনেক অর্থ আয় করেও আপনি শোচনীয় অবস্থায় থাকতে পারেন। একইভাবে সব হারিয়েও আপনি সুখে থাকতে পারেন। তাই বলছি, অর্থের মাধ্যমে নিজের মূল্যায়নের গুরুত্ব আদৌ আছে কি?

আমার ধ্যানধারণা আরেকটু ভিন্ন ছিল। সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা আর আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাস করা। আমি সবসময়ই উদ্যোক্তা হতে চাইতাম, কারণ আমার কখনোই অন্যের আদেশ মেনে কাজ করতে ভালো লাগতো না। নিজের ইচ্ছানুযায়ী করতাম সবকিছু। ইন্টারনেটে কাজ করার ধারণাটা আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, কারণ যে কোন জায়গা থেকে, যখন ইচ্ছে তখন কাজ করার সুযোগ আছে এতে।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম। 'আমি কি এমন চাকরি করবো যেটা আমি ঘৃণা করি, উপার্জনও আহামরি কিছু হবে না। নাকি উদ্যোক্তা হয়ে দেখবো, টাকা নাহয় নাই-ই কামালাম কিছুদিন?' খুব দ্রুত উত্তর পেয়ে গেলাম-উদ্যোক্তা হয়ে দেখব। এরপর আবার জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে, 'উদ্যোক্তা হয়ে যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় একঘেয়ে চাকরির খোঁজে, তাহলে কি আমার হারানোর কিছু থাকবে??

উত্তরঃ না।

বাইশ বছর বয়সী অনভিজ্ঞ বেকার হবার চাইতে পঁচিশ বছর বয়সী অনভিজ্ঞ বেকার হওয়াটা ভালো আমার মতে। তাতে কার কী আসে যায়?

সাফল্য/ব্যর্থতার গোলকধাঁধা

বৃদ্ধ পাবলো পিকাসো স্পেনের একটা ক্যাফেতে বসে ন্যাপকিনে আনমনে দাগ কাটছেন। কাজটা তিনি নির্লিপ্তভাবেই করে যাচ্ছিলেন। বাথরুমের দেয়ালে দুষ্টু ছেলেরা যেভাবে আঁকাআঁকি করে, তেমনিভাবে তার ভালো লাগার জন্য একটু আঁকিঝুঁকি করছিলেন। খালি পার্থক্য হলো, বাথরুমের দেয়ালে আঁকা হয় শিশ্নের

ছবি আর পিকাসোর হতে কফির দাগ পড়া ন্যাপকিন জন্ম নিচ্ছে ইম্প্রেসিস্ট ধরানো অসাধারণ কিছু।

যাই হোক পাশে বসা কিছু মহিলা তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষন পর কফি শেষ হলে পিকাসো ন্যাপকিনটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালেন ,বের হওয়ার পথে ছুঁড়ে ফেলবেন।

মহিলাটি তাকে থামালেন, আপনি যেই ন্যাপকিনে আঁকছিলেন, আমি কি তা পেতে পারি?আমি টাকা দিব তার জন্য।

পিকাসো বললেন, অবশ্যই। বিশ হাজার ডলার।

মহিলা তার মাথা এমনভাবে পিছনে নিলেন যেন পিকাসো তার দিকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছেন । কী বলছেন? এটা আঁকতে আপনার মাত্র বিশ মিনিট ও সময় লেগেছে ।

পিকাসো প্রত্যুত্তরে বললেন জি না, ম্যাডাম। আমার জীবনের যাটটি বছর লেগেছে এটা আঁকতে। ন্যাপকিনটি পকেটে পুরে পিকাসো ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলেন।

উন্নতির পিছনে থাকে অসংখ্য ব্যর্থতার গল্প। আপনার সফলতার বিশালতা নির্ভর করে আপনি কোনকিছুতে কতবার ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ যদি আপনার থেকে কোনকিছুতে ভালো হয়, তার মানে সে আপনার থেকে ঐ কাজে বেশিবার বার্থ হয়েছে। কেউ যদি আপনার থেকে বাজে হয়, তার মানে আপনি যে কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তার সে অভিজ্ঞতা হয়নি।

একটা শিশুর কথা চিন্তা করুন। সে হাঁটার চেষ্টা করতে গিয়ে শতবার পরে যাবে, ব্যথা পারে। শিশুটি একবারের জন্যও ভাববে না,হাঁটার কাজটা আমাকে দিয়ে হবে না। আমি এ কাজে ভালো না।

ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যাওয়ার শিক্ষা আমরা জীবনে কোন না কোন সময় শিখি। আমি নিশ্চিত, বেশিরভাগই আসে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে, যা কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব করে এবং যারা ভালো করে না তাদের ভোগায়। আরেকটা বড় অংশ আসে, একগুঁয়ে পিতামাতার কাছ থেকে, যারা তাদের সন্তানকে তাদের নিজের ইচ্ছেতে কিছু করতে দিতে চায় না। উল্টো নতুন কিছু করলে আরও শাস্তি দেয়। আর গণমাধ্যম তো আছেই। অবিরত মহাকাশ গবেষণায় একের পর এক সফলতার খবর দিচ্ছে, কিন্তু এর পেছনের নিরস অনুশীলন এবং একঘেয়েমিতার কথা বলছে না।

একটা সময় আমরা সবাই এমন এক অবস্থানে পৌঁছাই যে, ব্যর্থতার ভয় আমাদের তোঁকে ধরে। আমরা প্রবৃত্তিগতভাবে আমরা সেসব ব্যর্থতা এড়িয়ে যাই। আমরা তখন আমাদের ভালোজিনিসগুলো নিয়েই বসে থাকি।

এটা আমাদের অবরুদ্ধ এবং কণ্ঠরোধ করে ফেলে। আমরা কোনকিছুতে তখনই সত্যিকারভাবে সফল হতে পারব, যদি আমরা তাতে ব্যর্থ হতে রাজি থাকি। ব্যর্থতায় অস্বীকৃতি মানে সফল হওয়ার পথও বন্ধ করে দেওয়া।

এই ভয়ের কারণ হলো,ফালতু সব মূল্যবোধ বেছে নেওয়া। ধরা যাক, আমি নিজের জন্য একটা মানদন্ড তৈরি করলাম 'যাদের সাথে দেখা হবে, সবাই যেন আমাকে পছন্দ করে। আমি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকব। কারণ, ব্যর্থতার পুরোটাই নির্ভর করছে অন্যদের উপর। আমার নিজের কর্মের উপর নয়। আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই; তো আমার আত্মমূল্যায়ন অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে যদি আমি আমার মানদন্ড ঠিক করলাম, 'আমার সামাজিক জীবনের উন্নতি করতে হবে', তাহলে 'সবার আমাকে পছন্দ করা'র সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব। তারা আমার সাথে যেরকম ব্যবহারই করুক না কেন। আমার আত্মমূল্যায়ন আমার ব্যবহার এবং সুখের উপরই নির্ভর করবে।

অধ্যায় ৪ এ আমরা দেখেছি, ফালতু বা অপ্রয়োজনীয় মূল্যবোধ বস্তুগত লক্ষ্য ঠিক করে, যেগুলোর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব লক্ষ্যের পেছনে ছুটে চলা দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এবং কোনভাবে যদি তা অর্জনও করা যায়, তা আমাদের অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। কারণ একবার তা অর্জিত হয়ে গেলে সমাধান করার জন্য আর কোন সমস্যাই থাকল না।

সঠিক মূল্যবোধ প্রক্রিয়া নির্ভর। যেমন 'আমার সৎ ভাব সবার সাথে প্রকাশ করব এটা সততা নামক মূল্যবোধের একটা মানদন্ড মাত্র। এই 'সততা' কখনইপুরোপুরি শেষ হয়না।এটা এমন একটা সমস্যা যার সাথে বিরামহীনভাবে লেগে থাকতে হবে। প্রতিটি নতুন কথোপকথন, প্রতিটি নতুন সম্পর্ক,নতুনভাবে প্ররোচিত করে সততাকে প্রকাশ করার জন্য। জীবনভর চলবে এমনটা, যার কোন শেষ নেই ।

যদি আপনার মূল্যবোধের মানদন্ড হয় আর বাকি সবার মতোই- 'একটা বাড়ি আরদামী একটা গাড়ি কেনা' এবং আপনি বিশ বছর ধরে গাধার খাটুনি খেটে গেলেন, আপনি যখনই তা পেলেন ঠিক তখনই আপনার মানদন্ডের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। আপনার মধ্যজীবনের সংকট সমাধান করতে গিয়ে পুরো যৌবনটাই শেষ হয়ে গেল। বেড়ে ওঠা এবং উন্নতির আর কোন সুযোগ রইল না। উন্নতির ফলেই সুখ আসে, বস্তুগত অর্জনের মাধ্যমে সুখ নেই। সে হিসেবে, গতানুগতিক লক্ষ্য যা হয়ে থাকে কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা, লেকের ধারে বাড়ি, পনেরো পাউন্ড ওজন কমানো-এসব খুব নির্দিষ্ট পরিমাণ সুখ

বয়ে আনতে পারে। দ্রুত, স্বল্প সময়ের সুবিধার জন্য তা হয়তো উপকারী, কিন্তু চলার গতির নির্দেশক হিসেবে একদমই যুতসই নয়।

পিকাসো পুরো জীবনব্যাপী অসংখ্য সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি নব্বই বছর পার করেছিলেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তার সৃষ্টিশীলতা অব্যাহত ছিল। তার মানদন্ড যদি 'বিখ্যাত হওয়াঅথবা শিল্প জগতে প্রচুর অর্থ উপার্জন অথবা 'এক হাজার ছবি আঁকা' হতো, তাহলে একসময় তার গতি মন্থর হয়ে যেত। উৎকণ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা তাকে চেপে ধরত। দশকের পর দশক ধরে তার হাতের কারুকাজে যে উন্নতি এবং সৃজনশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দেখা সম্ভব হতো না।

পিকাসোর সফলতার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন যিনি খুশি মনে ক্যাফেতে বসে একাকী ন্যাপকিনে আঁকতে পারেন। তার মূল্যবোধে খুব সাধারণ আর বিনয়ের প্রকাশ ছিল, যার শেষ নেই। আর তা হলো, 'সৎ অভিব্যক্তি।আর ঠিক এই কারণেই ন্যাপকিনটার মূল্য এতো ছিল।

কষ্ট প্রক্রিয়ারই একটা অংশ

১৯৫০ সালে, কাজিমিয়ার্জ ডাবরোওস্কি নামে এজকন মনোবিদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জীবিত ব্যক্তিদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কীভাবে তারা এই বিভীষিকাময় যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে টিকে আছেন। পোল্যান্ডের অবস্থা খুব ভয়াবহ ছিল। এই মানুষগুলোকেঅনাহারে প্রাণ ঝরে যেতে দেখেছে, বোমা হামলা দেখতে হয়েছে যার ফলে শহরধূলিসাৎ হয়ে গেছে, গণহত্যা দেখেছে, যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, প্রিয়জনের ধর্ষণ অথবা মৃত্যুর ভয়াল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। নাৎসিদের হাত থেকে কোনভাবে রক্ষা পেলেও,কয়েক বছর পর সোভিয়েতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে।

যারা টিকে ছিল, ডাবরোওস্কি তাদের উপর গবেষণা করে যে ফল পান তা একই সাথে চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর। তাদের একটা বড় অংশ মনে করতেন, যুদ্ধকালীন সময়ে তারা যে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দুর্দশার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তার ফলে তারা অনেক বেশি দায়িত্বশীল এবং ভালো মানুষেপরিণত হয়েছে। এমনকি সুখীও হয়েছে অনেকে। যুদ্ধের আগের জীবনটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে অকৃতজ্ঞতা, পছন্দের মানুষকে উপলব্ধি করতে না পারা, আলস্য এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত জীবন। যুদ্ধ তাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা, কষ্টের রহস্য উন্মোচিত করে দেয়। যুদ্ধের পর তারা আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

অবশ্যই, তারা ভয়াল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এবং এই মানুষগুলোর জন্য সেসব অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর ছিল না। অনেকের আবেগের ক্ষত তখনও টাটকা । কিন্তু তাদের মাঝে কেউ কেউ সে ক্ষতকে ইতিবাচক এবং শক্তিরূপে গ্রহণ করে।

কেবল তারাই এভাবে বিপর্যয়কে কাটিয়ে গেছে তা নয়। বেশিরভাগ লোকের সবচেয়ে গর্বের অভিজ্ঞতা সবথেকে ভয়ানক পরিস্থিতির সামনে এসেছে। কষ্ট আমাদের আরও শক্তিশালী করে, আরও প্রাণবন্ত করে। ক্যান্সার জয় করা বহু লোকই বলেছেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয় তাদের আরও শক্তিমান করে তুলেছে। সামরিকবাহিনীর অনেকেই যুদ্ধের ভয়ানক পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকাকে তাদের প্রাণশক্তির মূল চালিকা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ডাবরোওস্কির মতে, উদ্বেগ, ভয় এবং বিষণ্নতা সবসময় অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। অথবা মনের জন্য ক্ষতিকারক নয়। বরং, অনেক সময়ই তারা মানসিক উন্নতির জন্য কষ্টের প্রতিনিধি। এই কষ্টকে অস্বীকার করা মানে নিজের সম্ভাবনাকে থামিয়ে দেওয়া। সুঠাম স্বাস্থ্যের জন্য একজনকে অবশ্যই শারীরিক কষ্ট করতে হবে, ঠিক তেমনি নিজেকে ভালোমতো চিনতে হলে, সুখময় জীবন গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই মানসিক কষ্ট ভোগ করতে হবে।

আমাদের মধ্যে বড় ধরণের পরিবর্তন তখনই আসে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। আর সেই মুহূর্তে তীব্র কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উপলব্ধি হয় আমাদের মূল্যবোধ কেন কাজ করছে না। আমাদের জীবন যাপনের ধারাকে প্রশ্ন ততক্ষণ পর্যন্ত করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ি। আর তখনই দিক বদলের চিন্তা আসে মাথায়।

এই অবস্থাকে আপনি 'তলানিতে গিয়ে ঠেকা' কিংবা 'অস্তিত্ব হুমকির মুখে আখ্যা দিতে পারেন। আমি একে 'ঝামেলাকে সয়ে নেয়া' বলব। এখন আপনি যেটা ইচ্ছে সেটা বলতে পারেন।

হয়তোবা আপনি এখনই সে অবস্থায় আছেন। হতে পারে, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ঝামেলা থেকে মুক্তির পথে আছেন। হতভম্ব হয়ে ভাবছেন কিভাবে আপনার পুর্বের সকল চিন্তাধারা ভুল প্রমাণিত হয়ে বদলে গেছে।

সবে মাত্র শুরু। বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু কষ্ট এই বদলে যাওয়ার প্রক্রিয়ারই একটা অংশ।কারণ কষ্ট সবখানেই আছে।এই বোধ আসাটা জরুরী। কারণ আপনি ভিন্ন উপায়ে কষ্টকে ঢেকে রাখতে চাইলে, ইতিবাচকতার ভ্রমে আটকে থাকলে, নেশায় জড়িয়ে পড়লে কিংবা অসৎ পথ বেছে নিলে কখনই পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত প্রেরণা পাবেন না।

ছোট থাকতে, আমার পরিবারে নতুন ভিসিআর বা স্টেরিওসেট এলেই হলো। আমি সবগুলো বাটন চেপে দেখতাম, প্রতিটি তার খুলে লাগিয়ে দেখতাম। শুধুমাত্র কোনটার কী কাজ দেখার জন্য। সময়ের সাথে সাথেআমি পুরো বিষয়টা ধরে ফেলতাম। পুরো বাড়িতে শুধুমাত্র আমিই জানতাম সব কিছুর ব্যবহার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত, একমাত্র আমিই জিনিসগুলো ঠিকঠাকমতো ব্যবহার করছি।

মিলেনিয়াল শিশুদের ক্ষেত্রে যা হয়, আমার বাবা-মা আমাকে বিস্ময় বালক ভাবতে শুরু করেন। ব্যবহার নির্দেশিকা ছাড়াই আমি ভিসিআর ব্যবহার করতে পারতাম। তাদের কাছে তাই আমি ছিলাম দ্বিতীয় টেসলা!

আমার বাবা-মার প্রজন্মের প্রযুক্তিভীতির প্রতি সহজে উপহাস করা যায়। কিন্তু বড় হতে হতে আমি বুঝেছি, বাবা-মার নতুন ভিসিআরের মতো আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন অনেক বিষয় থাকে। আমি বসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ভাবি ‘কীভাবে সম্ভব?’অথচ, হয়তো জিনিসটা খুবই সাধারণ।

অনেক লোক এ ধরনের প্রশ্ন করে আমাকে ইমেইল করেন। অনেক বছর ধরে আমি বুঝতাম না তাদের কি লিখে পাঠাব।

এক মেয়ে ইমেইল করেছিল। তারবাবা-মা দুজনই অভিবাসী। তারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে মেয়েটিকে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি করেন। মেয়েটি এখন মেডিকেল স্কুলে পড়ছে; কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারছে না। সে ডাক্তার হিসেবে নিজের জীবন কাটাতে চায় না। তাই সে মেডিকেল স্কুল ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু তবুও সে ওখানে আটকে আছে। কিছু বুঝতে না পেরে, সে ইন্টারনেট সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষকে (আমাকে) বোকার মতো প্রশ্ন দিয়ে ইমেইল করে, ‘কীভাবে আমি মেডিকেল স্কুল ছাড়ব?

অথবা কলেজ পড়ুয়া ছেলেটির কথাই চিন্তা করুন। সে তার শিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপ, হাসি, ছোট ছোট কথা তার কাছে মানসিক যন্ত্রণারপর্যায়ে চলে গিয়েছে। সে আমাকে আস্ত একটা নভেলার সাইজের, প্রায় আটাশ পাতার ইমেইল পাঠায়। এর মধ্যে জিজ্ঞেস করে, ‘আমি কীভাবে তাকে বলব?’ অথবা ঐ অবিবাহিতা মায়েরকথাই ধরুন। তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা স্কুলের পাট চুকিয়ে এখনো বাড়িতে গা এলিয়ে বসে বসেখাবার খায়, টাকা উড়ায়। কিন্তু তিনি এখন একটু একান্তে থাকতে চায়। তিনি চান তার সন্তানেরা নিজের মতো করে চলুক, পাশাপাশি নিজেও নিজের মতোথাকতে চান। কিন্তু তারপরেওতিনি সন্তানদের দূরে ঠেলে দিতে ভয় পাচ্ছেন। আর আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, ‘কীভাবে আমি ওদের আমার বাসা থেকে যেতে বলব?

এগুলো ভিসিআরের মতোই অবস্থা। দূর থেকে দেখলে সহজেই উপদেশ দেওয়া যায়ঃ কথা কম বলেকাজটা করে ফেলো। কিন্তু তাদেও অবস্থা বিবেচনা করলে দেখবেন, পরিস্থিতি খুবই জটিল।

এই প্রশ্নগুলো বেশ মজার। কারণ, যারা এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে এর উত্তর খুবই জটিল। আর যাদের এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে না, তাদের জন্য খুবই সহজ।

এখানে সমস্যা হলো পীড়া। মেডিকেল স্কুল ছাড়ার কাগজ পূরণ করে জমা দেয়াটা সোজা এবং সহজ সমাধান; কিন্তু বাবা-মার হৃদয় ভাঙাটা নয়। শিক্ষিকাকে প্রেম নিবেদন করাটা তো আর কঠিন বিষয় নয়; কিন্তু বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়ার ঝুঁকি এবং প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়টা অনেক গভীর। নিজের বাড়ি থেকে কাউকে বের হতে বলাটা মামুলি একটা বিষয়; কিন্তু নিজের সন্তানকে পরিত্যাগ করা এত সহজ নয়।

কৈশোর এবং যৌবনের শুরুতে আমি সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে উদ্বেগে ভুগতাম। দিনের বেশিরভাগ সময় আমি ভিডিও গেমস খেলে এবং রাতে পান করে ও সিগারেট টেনে আমার অস্বস্তিকে দূরে রাখার চেষ্টা করতাম। অনেক বছর ধরে, অপরিচিত মানুষ, বিশেষ করে সে যদি হয় আকর্ষণীয়, আমুদে এবং সবার পছন্দের, তাদের সাথে আমি কথা বলতে পারতাম না। আমি হতবিহ্বল হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম-

'কীভাবে সরাসরি একজন মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলা সম্ভব? মানুষ এটা কীভাবে করে?

এই ব্যপারে আমার আজগুবী বিশ্বাস ছিল। যেমন, প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কথা বলা যাবে না। কাছে গিয়ে হ্যালোবললেই ঐ মহিলা আমাকে ধর্ষক ভাবা শুরু করবে।

সমস্যা হলো, আমার আবেগ বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। কারণ আমার মনে হতো, মানুষ আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী না। এটা আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়। আর তাতেই আমার মনে প্রশ্নের উত্থান হতো, কীভাবে সরাসরি একজন মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলতে হয়?

কারণ আমি 'বাস্তবতা' থেকে আমার ধারণা এর পার্থক্য করতে পারিনি। আমার ধারণা থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক বিষয়টি বুঝতে পারিনি, পৃথিবীতে যেকোনো সময় দুজন মানুষের কথোপকথন হতে পারে।

অনেকেই দুঃখ, রাগ এবং হতাশায় পড়লে সব ফেলে দিয়ে একাকী বসে বিষোদগার করে থাকে। তাদের লক্ষ্য হলো, যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে সতেজ

করে তোলা। প্রয়োজনে নেশায় ডুবে গিয়ে কিংবা ভুল মূল্যবোধের কাছে ফিরে যেতে হলেও এমনটা করে থাকে।

আপনার বেছে নেয়া কষ্টটাকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করুন। নতুন মুল্যবোধ বেছে নেয়ারঅর্থ হলো জীবনে নতুন আরেকটা কষ্টের সংযোজন। একে সাদরে গ্রহণ করুন, উপভোগ করুন। তারপর একে অবজ্ঞা করুন।

মিথ্যে বলবো না। প্রথম দিকে এটা খুবই কঠিন মনে হবে। কিন্তু আপনি সাধারণভাবে তা শুরু করতে পারেন। মনে হতে পারে, কী করতে হবে আপনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আগেও বলেছি, আপনি কিছুই জানেন না। যদি ভাবেন আপনি জানছেন, আপনি কী করছেন তা আসলেই জানেন না। তো এখানে হারানোর কি আছে?

জীবন মানেই অজ্ঞানতার পরেও কাজ করে যাওয়া। এটাই জীবন। এমনকি আপনি যখন সুখে থাকেন তখনও। লটারি জিতে জেট স্কির ছোটখাট একটা বহর কিনে ফেলেও আপনি জানেন না কী করছেন। কখনোই এটা ভুলবেন না। এবং কখনোই এটা নিয়ে ভয় পাবেন না।

‘কিছু করার’ নীতি

২০০৮ সালে, ছয় সপ্তাহ চাকরি করার পর, অনলাইনে ব্যবসা করার জন্য আমি তা ছেড়ে দেই। সে সময় আমার কোন ধারণাই ছিল না কী করছি। তবে মনস্থির করি, আমার যদি করুণ পরিণতিও হয়, তবু আমি নিজের শর্তমতো কাজ করতে পারব। আর সে সময়টা আমার মাথায় খালি মেয়েদের পিছে ঘোরার চিন্তা থাকত। যা থাকে কপালে ভেবে, আমি আমার ডেটিঙের অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্লগ লেখা শুরু করলাম।

প্রথম যেদিন আমার ঘুম ভাঙে, আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। ল্যাপটপ নিয়ে বসে প্রথমবারের মতো অনুধাবন করলাম, আমার সিদ্ধান্ত এবং পরিণতির সকল দায়ভার আমাকেই নিতে হবে। ওয়েব ডিজাইনিং, ইন্টারনেট মার্কেটিং এবং আরও অনেক বিশেষ জ্ঞানে নিজেকে আলোকিত করার দায়ভারও নিতে হবে। এখন সবকিছুই আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। চব্বিশ বছরের একটা লোক চাকরি ছেড়েকী করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছে না। আমি কয়েকটা কম্পিউটার গেমস নামিয়ে খেলতে শুরু করলাম। কাজ থেকে দূরে থাকলাম, যেন তা ইবোলা ভাইরাস।

সপ্তাহটা এভাবেই পার হয় এবং আমার ব্যাংক একাউন্টও শেষ হওয়ার পথে। নতুন একটা কাজ শুরু করতে গেলে দিনে বারো থেকে চৌদ্দ ঘন্টা খাটতে

হয়। বুঝতে পারলাম কাজের সময়কে সেভাবে তৈরি করতে হলে আমাকে পরিকল্পনা মাফিক এগোতে হবে। অপ্রত্যাশিত একটা জায়গা থেকে সেই পরিকল্পনাটা আসে।

হাইস্কুলে আমার অঙ্ক শিক্ষক ছিলেন মি. প্যাকউড। তিনি সবসময় বলতেন, 'কোন সমস্যায় পড়লে, বসে না থেকে চিন্তা করো; কাজ শুরু করো। তুমি যদি নাও বুঝতে পারোকী করছো, তা-ও চালিয়ে যাও। দেখবে ঠিকই সঠিক চিন্তাটা তোমার মাথায় উঁকি দিবে।

প্রথম দিকগুলোতে, প্রতিদিনই আমাকে সংগ্রাম করতে হতো। কী করতে হবে কিছুই বুঝতাম না এবং ফল নিয়ে খুব আতঙ্কে থাকতাম। মি. প্যাকউডের উপদেশ আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। আমি মন্ত্রের মতো শুনতে পাই, 'শুধু শুধু বসে থেকো না। কিছু করো। উত্তর আপনা থেকেই পেয়ে যাবে।

মি. প্যাকউডের উপদেশ কাজে লাগানোর সময়, প্রেরণা সম্পর্কে আমি নতুন শিক্ষা পাই । এই শিক্ষা পাওয়ার জন্য আমার আট বছর লেগেছে।

সেই মাসের পর মাস গণ্ডানিকর জীবন যাপন, এডভাইজ কলামে হাস্যকর সব লেখা, বন্ধুর বাসায় কাউচের উপর কাটানো অস্বস্তিকর রাতগুলো, ব্যাংক ঋণে ডুবে থাকা আর হাজার হাজার লেখাগুলোই (যেগুলো কেউই কোনদিন পড়েনি) আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা দিয়েছে।

কাজ শুধু অনুপ্রেরণার ফল না, বরং অনুপ্রেরণা পাবার মূল রহস্যই হচ্ছে কাজ করা ।

পর্যাপ্ত প্রেরণা থাকলে আমরা যে কোন কাজ করি। আর প্রেরণার জন্য দরকার হয় আবেগের উদ্দীপনা। আমার মনে হয় এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া-

আবেগের উদ্দীপনা→প্রেরণা→ প্রত্যাশিত

শ্রম আপনি যদি যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ছাড়া কিছু করতে চান, আপনি ধরেই নেন, আপনি কাজটা করতে পারবেন না। আপনার করার কিছুই নেই। জীবনে আবেগকে আন্দোলিত করার মতো কোন ঘটনা হওয়ার আগে আপনি উঠে দাঁড়ানোর তাগিদ অনুভব করবেন না।

প্রেরণা বিষয়টি হলো, এটা আসলে শুধুমাত্র তিনটি অংশের ধারাবাহিকতা নয়, বরং বিরামহীন চক্রের ন্যায়-

উদ্দীপনা→ প্রেরণা⇒শ্রম → উদ্দীপনা⇒ প্রেরণা⇒ শ্রম⇒ ইত্যাদি

আপনার কাজ নতুন করে আবেগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সেটাকে উদ্দীপ্ত করে এবং আপনার কাজে পুনরায় প্রেরণা যোগায়। এই জ্ঞানের সুবিধা নিয়ে, আমরা নিচের উপায়ে নিজেদের মনোভাবে পরিবর্তন আনতে পারি-

শ্রম⇒ উদ্দীপনা⇒ প্রেরণা

আপনার যদি জীবনে প্রেরণার অভাব থাকে, তাহলে যে কোন কাজ শুরু করুন যে কোন কিছু, সত্যি। তারপর ফল অনুযায়ী কাজ করুন। নিজেকেই নিজে অনুপ্রেরণা যোগান।

আমি একে 'কিছু করো' নীতি বলি। নিজের ব্যবসা আমি এভাবেই দাঁড় করিয়েছি। এরপর সে অভিজ্ঞতা 'আমি চাকরিতে কীভাবে আবেদন করবো? কিংবা আমি ওই ছেলেকে কীভাবে বলব আমি ওর গার্লফ্রেন্ড হতে চাই' ধরণের প্রশ্নে আবদ্ধ হয়ে থাকা পাঠকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছি।

প্রথম কয়েক বছর, আমি নিজের জন্য কাজ করেছি। প্রথম কয়েক বছর স্রেফ নিজের জন্য কাজ করে গেছি। এমনও হয়েছে, পুরো সপ্তাহ জুড়ে তেমন কিছুই করিনি।আমি উদ্বিগ্ন এবং চাপের মধ্যে ছিলাম, এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। চাইলে সহজেই সবকিছু বন্ধ করে দিতে পারতাম। অবশ্য আমি খুব দ্রুত শিখছিলাম। নিজেকে জোর করে কাজ করাতাম। আলতু-ফালতু ধরণের ছোটখাট কাজগুলো করে লাভ হয়েছিল যে কঠিন কাজগুলোকে আর কঠিন লাগতো না। আমাকে যদি কোন ওয়েবসাইটের ডিজাইন নতুন করে করতে হয়, আমি বসে নিজেকে বলব, "ঠিক আছে, এখন শুধু হেডারটাই ঠিক করি।কিন্তু হেডারের কাজ শেষ হলে আমি অন্য অংশগুলোও ঠিক করতে শুরু করি। এবং বুঝে ওঠার আগেই আমি উদ্যম নিয়ে কাজটার ভিতর ঢুকে পড়তাম।

লেখক টিম ফেরিস একবার তার শোনা একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। এক ঔপন্যাসিকের গল্প, যিনি সত্তরের অধিক উপন্যাস লিখেছেন। কেউ একজন সেই ঔপন্যাসিককে জিজ্ঞেস করে সে কিভাবে এত ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর ছিলেন। তার উত্তর ছিল,দিনে দুইশত আজেবাজে শব্দ, ব্যস।উদ্দেশ্য হলো সে নিজেকে দুইশত আজেবাজে শব্দ লেখার জন্য জোর করলে, লেখার গতির জোরেই তিনি হাজারটি শব্দ লিখে ফেলবেন।

'কিছু করতে হবে'নীতি অনুসরণ করলে, ব্যর্থতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না। শুধু কাজ করাকে সফলতার নমুনা ধরলে, যেকোনো ফলকে গুরুত্বপূর্ণ এবং

প্রগতি হিসেবে বিবেচনা করলে, উদ্দীপনাকে পূর্বশর্ত না ভেবে পুরষ্কার হিসেবে নিলে আমরা নিজেদের সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারব। আমরা ব্যর্থতায় আর ভয় পাবোনা এবং একটা সময় এই ব্যর্থতাই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই 'কিছু করার' নীতি শুধু অলসতাকে ঝেড়ে ফেলতে সহায়তা করে না, বরং এর মাধ্যমে আমরা নতুন মূল্যবোধ গ্রহণ করা শিখি। আপনি বাজে সময় পার করছেন, সব কিছু অর্থহীন লাগছে, নিজেকে হীন মনে হচ্ছে, আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করছেন; আপনি দিবা স্বপ্নের পেছনে সময় নষ্ট করছেন কিংবা নিজের মানদন্ড নিয়ে সন্দেহে ভুগছেন কিন্তু সেটাকে ঠিক পথে নিয়ে আসবেন কীভাবে তাও জানেন না? তাহলে আপনার জন্য করণীয় একটাই-

'কিছু করুন।

এই 'কিছু'টা হতে পারে ছোট্ট একটা কোন কাজ। যেটা আপনাকে উৎসাহ যোগাবে এগিয়ে যাওয়ার।

মনে করুন, আপনি বিগত সব সম্পর্কে ব্যর্থ হয়েছেন আপনার নিজের দোষেই । এখন চাচ্ছেন আরেকটু বেশি সহানুভূতির সাথে এগোতে? তাহলে কিছু একটা করুন।

সহজটা দিয়েই নাহয় শুরু করা যাক। প্রথমে ঠিক করুন অন্যের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তাকে সাহায্য করে সময় কাটাবেন। স্রেফ একবার করে দেখুন। কিংবা নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন এরপরের বার মনমেজাজ খারাপ হলে ধরে নেবেন তার জন্য আপনি নিজেই দায়ী থাকবেন। এভাবে চিন্তা করে দেখুন কেমন লাগে।

শুরু করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অনুপ্রেরণাকে জিইয়ে রাখার জন্য এই কাজটাই অনেক। হাতের কাছেই সমাধান আছে। কিছু করাটাকেই যদি নিজের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে দেখবেন ব্যর্থ হলেও খুব খারাপ লাগছে না। বরং সেই ব্যর্থতাই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অধ্যায় ৮

'না' বলার গুরুত্ব

২০০৯ সালে, আমার সবকিছু ছেড়ে লাতিন আমেরিকায় পাড়ি জমাই। এতদিনে ডেটিং বিষয়ে আমার ব্লগটি ভালোই চলতে শুরু করেছে। পিডিএফ বিক্রি এবং অনলাইন কোর্স এর মাধ্যমে আমি মোটামুটি আয় করছিলাম। তবে আমার পরিকল্পনা ছিল কয়েক বছর বিদেশে ঘুরে নতুন সংস্কৃতির স্বাদ নেয়া। এবং এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জীবন যাত্রার কম খরচকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসাকেও সম্প্রসারিত করা। ডিজিটাল যুগের এক ভবঘুরের স্বপ্ন, ২৫ বছর বয়সী রোমাঞ্চপ্রেমী হিসেবেআমি এই জিনিসটাই চাচ্ছিলাম |

আমার পরিকল্পনা শুনতে উত্তেজনায় পরিপূর্ণ মনে হলেও যেসব মূল্যবোধ আমাকে এই যাযাবর জীবন যাপনে উৎসাহ দিচ্ছিলো সেসব মূল্যবোধের সবগুলোই আমার জন্য কল্যাণকর ছিল, তা বলব না। প্রশংসা করার মতো যেগুলো ছিল সেগুলো হলো পৃথিবীকে দেখার সুতীব্র বাসনা, নতুন সংস্কৃতি আর মানুষের সাথে পরিচিত হবার আগ্রহ, পুরানো আমলের মানুষদের মতো অ্যাডভেঞ্চার প্রেম। কিন্তু এর মাঝেই কোথায় যেন খুঁতখুঁত লাগছিলো। সেসময় পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। কিন্তু জানতাম কোথাও না কোথাও ভুল করে এসেছি, মূল্যবোধ ঠিক ছিল না আমার। দেখতে পাচ্ছিলাম না ঠিকই কিন্তু যখন নিজের সাথে সম্পূর্ণ সৎ থাকতাম তখন অনুভব করতে পারছিলাম।

কৈশোরের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য আমি দায়বদ্ধতার ব্যাপারে বরাবরই কাঁচা ছিলাম। কৈশোরের অভিজ্ঞতার মাসুল হিসেবে অনেক দিন ধরেই নিজেকে উড়তে দিয়েছি। যার ফলে মনে ধারণা ঢুকে গিয়েছিল চাইলেই যে কারো সাথে দেখা করতে পারি, যে কাউকে বন্ধু বানাতে পারি, যাকে ইচ্ছে তাকে ভালোবাসতে পারি কিংবা তার সাথে শুতেও পারি—সুতরাং দায়বদ্ধতার প্রশ্নের মুখোমুখি হবার দরকারটা কি। তাও আবার স্রেফ একটা মানুষের প্রতি? কিংবা নির্দিষ্ট একটা দল বা দেশের প্রতি অনুরাগ দেখানোরও মানে পাইনি কখনো। যদি সবকিছুই সমান ভাবে পেতে পারি তাহলে সব কিছুই পাওয়া উচিত। তাইনা?

এই ধারণা পুষে রেখেই পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশ থেকে দেশে আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমি পঞ্চান্নটি দেশ ঘুরেছি, অনেক বন্ধু বানিয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে ঊষা ব্যবহারও পেয়েছি । নতুন বন্ধু হলে তাদের কথা ভুলে যেতাম। কয়েকজনের কথা তো পরবর্তী ফ্লাইটে অন্য আরেক দেশে যাওয়ার আগেই ভুলে যেতাম।

জীবনটা অদ্ভুত ছিল। ফ্যান্টাসির জগতে ছিলাম যেন, ভুলতে না পারার মতো বহু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কষ্টকে ঢেকে রেখেছিলাম সেসময়টা। তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলেও একই সাথে অর্থহীনও সময় গিয়েছে সেটা। জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের অনুপ্রেরণা এই ভ্রমণের সময়টাতেই অর্জন করেছি আমি। কিন্তু একই সময়ে অনেক সময় আর কর্মশক্তিরও অপচয় করেছি।

এখন আমি নিউ ইয়র্কে থাকি। আমার বাসা আছে, আসবাব আছে, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল দিই, স্ত্রীও আছে। এসবের কোনটাতেই উত্তেজনা বা চাকচিক্য নেই। আর আমি এভাবেই থাকতে পছন্দ করি। এত বছরের উদ্দাম জীবন যাপনের পরে আমি যে সত্যের মুখোমুখি হয়েছি তা হলো, অবাধ স্বাধীনতা বলে আসলে কিছুই নেই।

স্বাধীনতা অর্থবহ কিছু করার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা ধারণাটার নিজস্ব অর্থ নেই। জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ কিছু করার একমাত্র উপায় হলো একাধিক বিকল্প থেকে যে কোন একটা বেছে নেয়া। স্বাধীনতার পরিসীমাকে ছোট করে আনা, একটা নির্দিষ্ট জায়গার, বিশ্বাসের কিংবা নির্দিষ্ট একটা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করা।

ভ্রমণে থাকাকালীন আমার মাঝে এই উপলব্ধিটা আসে।

জীবনের অসংখ্য সুযোগ-সুবিধার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে বুঝতে পারবেন আসলে এগুলো করে আপনি সুখ অনুভব করছেন না। ভ্রমণে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। তেপান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন নাম্বার দেশ ভ্রমণ করতে করতে বুঝতে করলাম আমার সব অভিজ্ঞতাই অসাধারণ আর রোমাঞ্চকর হলেও, সব গুলো মনে রাখতে পারছি না। অন্যদিকে দেশে আমার বন্ধু-বান্ধবরা বিয়ে-শাদি করে ফেলেছে, বাড়ি কিনছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর গরম গরম রাজনৈতিক ইস্যুতে জড়িয়ে পড়ছে। সেখানে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

২০১১ সালে আমি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ ভ্রমণে যাই। ওখানকার খাবার ভয়াবহছিল। আবহাওয়াও একেবারে ফালতু (মে মাসে তুষারপাত! বিশ্বাস করা যায়?) আমার অ্যাপার্টমেন্ট ছিল কল্পনার বাইরে জঘন্য। সবকিছুর দাম

আকাশছোঁয়া। মানুষগুলো কেমন রূঢ়। কাউকে হাসতে দেখিনি আর সবাই মদ গিলছে অনবরত। কিন্তু তারপরও ঐ ভ্রমণ আমার প্রিয় ভ্রমণ গুলোর একটা ।

রাশিয়ান সংস্কৃতিকে একরকমের কাঠখোটাই বলা যায়। পশ্চিমাদের হজম সহজে হওয়ার মতো না। কৃত্রিম ভদ্রতা আর বিনয়ী কথার ধার ধারে না এখানে ।

অপরিচিত কারো দিকে তাকিয়ে হাসার বালাই নেই, ভালো না লাগলে ভালো লাগার ভান ধরার দরকার নেই। রাশিয়ায় যদি কোন কিছুকে ফাগড় পাসে সোজা বলে দেবেন ফালতু। কেউ অশোভন আচরণ করলে সেটা মুখের উপর বলে দিতে ছাড়বেন না। কাউকে ভালো লেগে থাকলে জানিয়ে দিন। সেই ভালো লাগার মানুষটি বন্ধু হোক, অচেনা মুখ হোক কিংবা পাঁচ মিনিট আগে পরিচা হওয়া মানুষটা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

রাশিয়াতে আসার প্রথম সপ্তাহটা খুবই অস্বস্তির মাঝে কাটাই। এক রাশিয়ার সুন্দরীর সাথে ডেটেও গিয়েছিলাম। মেয়েটা তিন মিনিটের মাথায় আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকানো শুরু করলো। এরপরে বলে ফেললো, আমি এতক্ষণ যা কিছু বলেছি সবই নাকি হাস্যকর আর বোকার মতো। কথা শুনে গলায় কথি আটকে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। কিন্তু কথার ভঙ্গিতে আক্রমণাত্মক ভাবটা নেই। যেন খুব সাধারণ কিছু বলছে। আজকের আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করছে কিংবা ওর জুতোর সাইজ কত সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে। পশ্চিমে এমন কথা বললে রীতিমতো অভদ্রতা হিসেবে ধরা হতো, তাও মাত্র পরিচয় হয়েছে এমন কেউ বললে।কিন্তু এখানে সবাই-ই এমন চাঁছাছোলা। যার ফলে আমার নরম পশ্চিমা মন আতঙ্কিত হচ্ছিলো আক্রমণের শিকার হয়ে। দীর্ঘদিন পর চাপা পড়ে থাকা সংশয়গুলো যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো।

কিন্তু ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে শুরু করলাম সবকিছু। বরং পছন্দ হয়ে যেতে লাগলো ব্যাপারগুলো। সহজাত প্রবৃত্তির নিঃসংকোচ প্রকাশ। সবার সাথে সবার শর্তবিহীন সম্পর্ক, কোন পিছুটান নেই, কেউ কিছু বিক্রির বান্দা করছে না, লুকানো কোন অভিপ্রায় নেই কার, সবার পছন্দের পাত্র হবার বাসনাও নেই।

দীর্ঘদিন ধরে আমি যত জায়গায় ঘুরেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ আমেরিকান স্থানের মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ উপরে থাকবে। সেই স্থানগুলোর মধ্যে ভিন্ন এক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলাম। যা ইচ্ছে তাই বলার স্বাধীনতা। প্রতিক্রিয়ার ভয় না রেখেই মনের কথা মুখে বলে ফেলতে পারার সুযোগ। যেন অদ্ভুত রকমের এক মুক্তির ঠিকানা, যার মূলকথাই হলো প্রত্যাখ্যান করতে

পারা। আর আমার মতো যারা মুখ বাঁচিয়ে চলেছে ভগ্ন পরিবারের সদস্য হয়ে, আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগেছে, তাদের জন্য সুবর্ণ এক সুযোগ হয়ে দেখা দেয়। আমি রীতিমতো নেশায় পড়ে যাই তাদের এই সংস্কৃতিতে। যেন সেরা ভদকা আকন্ঠ পান করছি। পিটার্সবার্গে সময় কোথা দিয়ে চলে গেছে টেরও পাইনি। ফেরার সময় মন চাইছিলো না আসতে।

ভ্রমণকে আত্মউন্নয়নের চমৎকার এক হাতিয়ার বলা যায়। আপনার সংস্কৃতির মূল্যবোধের হাত থেকে মুক্ত করে ভিন্ন একটা সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। যে সমাজের মূল্যবোধ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তাদের দিন কেটে যাচ্ছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। আপনি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছেন, সেটা হয়তো সর্বোত্তম উপায় না-ও হতে পারে-এই সত্যটাই আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারে। নতুন ধরণের জীবনধারা দেখে আপনি আপনার অভ্যাসকে প্রশ্ন করতে পারেন। রাশিয়া আমাকে আমার অ্যাংলো সংস্কৃতির সামাজিকতার মুখোশ খুলে দিয়ে কৃত্রিম ভদ্রতার মুখে চপেটাঘাত করে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবতে লাগলাম, হয়তো এই কারণেই আমরা একে অন্যকে নিয়ে এত সংশয়ে ভুগি, এর জন্যই ঘনিষ্ঠতা গড়তে ভয় পাই।

এই ব্যাপারটা নিয়ে একদিন আমার রাশিয়ান শিক্ষকের সাথে কথা বলেছিলাম বলে মনে পড়ে। তিনি একটা থিওরি দিয়েছিলেন। কমিউনিজমের দিনগুলোতে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা খুব কম পাওয়া যেত। সবাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। রাশিয়ান সমাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটা ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠা করে- বিশ্বাস। আর বিশ্বাস গড়তে চাইলে আপনাকে সৎ হতেই হবে। এরমানে হচ্ছে যখন খারাপ সময় যাচ্ছে, তখন সেটা স্বীকার করে নিন। ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। রূঢ় সত্যবাদিতার দরকার ছিল। টিকে থাকার জন্য সত্যবাদিতার বিকল্প নেই । কার উপর ভরসা করতে পারবেন আর কার উপর পারবেন না সেটা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা লাগতো। তাও খুব অল্প সময়ে তা বুঝতে হতো।

কিন্তু এই 'মুক্ত' পশ্চিমে, রাশিয়ান শিক্ষক বলে চললেন, এখানে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের অভাব নেই। এত বেশি সুযোগ সুবিধা যে নিজেকে নির্দিষ্ট একটা ধরণে প্রকাশ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই প্রকাশের ধরণ কৃত্রিম হলেও সমস্যা নেই। বিশ্বাস নিজের মূল্য হারিয়ে ফেলে এখানে। বাহ্যিক রূপ আর মুখরতাই প্রাধান্য পেতে লাগল। অল্প কয়েকজনের সাথে ঘনিষ্ঠ থাকার চেয়ে একাধিক মানুষের সাথে মৌখিক সম্পর্ক রক্ষা করাটা এখানে লাভজনক।

এজন্যই পশ্চিমাদের মধ্যে জোর করে হাসিমুখে আর নরম সুরে কথা বলাটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। নির্বিকারভাবে মিথ্যে বলা আর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সম্মতি

দেয়াটা এখানে স্বাভাবিকতায় রূপ নিয়েছে। যাদেরকে পছন্দ করা হয় না তাদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা হয় এখানে, উপহার বিনিময় করতেও পিছপা হয় না কেউ। এই ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা গড়ে উঠার পেছনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দায়ী।

এমন সংস্কৃতি গড়ে উঠার বিপদ হলো, আপনি বুঝতে পারবেন না কাকে বিশ্বাস করবেন আর কাকে করতে পারবেন না। বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে পরিবারের সদস্যদের মাঝেও এমনটাই হয়। পশ্চিমে সবার পছন্দের পাত্র হওয়ার মানসিকতা মনের উপর চাপ ফেলে। যে কারণে মানুষভেদে নিজের স্বভাব-চরিত্র, কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত পাল্টে ফেলে অনেকে। যাতে তার প্রিয়পাত্র হতে পারে।

প্রত্যাখ্যান আপনার জীবনকে সহজ করে তোলে

ইতিবাচক/ভোগবাদী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে আমাদের শেখানো হয়েছে যতটা সম্ভব ইতিবাচক হতে। এটি ইতিবাচক চিন্তার বইগুলোর মূলভিত্তি-সুযোগ গ্রহণ করুন, সবাইকে এবং সব কিছুকেই হ্যাঁ বলুন।

কিন্তু আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারার প্রয়োজন আছে। আর সেটা করতে না পারার মানে হলো আমরা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছি। ধীরে ধীরেজীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলছি। আমাদের মূল্যবোধ বলে কিছু আর থাকবে না, জীবনের উদ্দেশ্যও আর খুঁজে পাওয়া হবে না কখনো।

প্রত্যাখ্যানকে এড়িয়ে যাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়, আমাদের ভালো লাগানোর জন্য। কিন্তু তা আমাদের সাময়িক পরিত্রাণ দিলেও, আমাদের উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীনে পরিণত করে।

কোন কিছুর মূল্য অনুধাবন করতে হলে আপনাকে সেই 'কিছু'র প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। আপনি যখন কেবল একজনকেই মন থেকে ভালোবাসবেন, কেবল একটা কাজই শিখবেন মনপ্রাণ দিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট একটা পেশাকে বেছে নেবেন ঠিক তখনই অপার আনন্দ লাভ করবেন। জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাবেন। কিন্তু এই সাফল্য আপনি একাধিক বিকল্প সাফল্যর সুযোগ থেকে বেছে নিতে হবে। ঠিক কোন ব্যাপারে নিজের সবকিছু বিনিয়োগ করবেন।

নির্দিষ্ট একটা মূল্যবোধ বেছে নেয়ার মানে বিকল্পগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। আমি যদি বৈবাহিক জীবনকে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভাবি, তার মানে আমি কোকেইন আসক্ত বাজে মেয়েদের আমার জীবন থেকে বাদ দিচ্ছি। যদি আমাকে বন্ধুত্ব মনোভাবের মানদণ্ডে বিচার করি, তাহলে আমি

বন্ধুদের পিছনে বাজে ব্যবহারকে বাদ দিচ্ছি। এসব ভালো সিদ্ধান্ত নিতে হলেও অনেক কিছু ঝেড়ে ফেলতে হয়।

বিষয় হলো, আমাদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু বেছে নিতে হবে গুরুত্ব দেবার জন্য। এখন সেই কিছু কে গুরুত্ব দিতে চাইলে অন্য সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। ধরুন, আপনি 'ক' নামক ব্যাপারকে মূল্য দিচ্ছেন, এখন এই 'ক' কে মূল্য দিতে হলে সেই সব ব্যাপারকে বাদ দিতে হবে যেখানে 'ক' এর উপস্থিতি নেই।

প্রত্যাখ্যান মূল্যবোধ রক্ষার জন্য খুবই জরুরী। আমরা কী বাদ দিচ্ছি তার উপর আমাদের পরিচয় নির্ভর করে। আর যদি আমরা কিছুই বাদ দিতে না পারি (হয়তোবা নিজের কোন আচরণ বাদ দেওয়ার ভয়ে), তাহলে আমাদের কোন পরিচয়ই থাকল না।

প্রত্যাখ্যান, সংঘর্ষ আর বিরোধিতাকে যে কোন উপায়ে এড়িয়ে চলার প্রবণতা, সবকিছুকে সমান ভেবে সাম্যতা বজায় রাখার ইচ্ছেকে একধরণের বদ অভ্যাস বলা যায়।

এধরণের প্রবণতা যাদের আছে তারা ভাবে সব সময় নির্ঝঞ্ঝাট, ঝামেলাবিহীন জীবন তাদের প্রাপ্য। প্রত্যাখ্যানকে অন্য কারো মন খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রত্যাখ্যানকে পাশ কাটিয়ে যায়। আর যেহেতু তারা প্রত্যাখ্যান করা শিখছে না, সেহেতু তারা সব সময় অর্থহীন আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকে। সবসময় সবাইকে খুশি রাখার প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে। যাতে ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে না হয়, সুখের পালা আরেকটু যাতে দীর্ঘ করা যায়।

প্রত্যাখ্যান করতে পারা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। সম্পর্কে সুখ না থাকলে কেউই তাতে আটকে থাকতে চায় না। কেউই এমন কোন কাজ করতে চায় না, যা সে ঘৃণা করে এবং যাতে তার আস্থা নেই। কেউই এমন কথা বলতে চায় না যেটা সে মন থেকে বলছে না।

তবুও মানুষ এসব বেছে নিচ্ছে। সব সময়।

সততা মানুষের প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি। কিন্তু আমাদের জীবনে সততা চর্চার মানে হলো 'না' বলা এবং শোনার সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়া। আর ঠিক এভাবেই প্রত্যাখ্যান আমাদের মাঝের সম্পর্কগুলোকে আরো সুন্দর এবং সুখময় করে তোলে।

সীমারেখা

একদা, দুজন প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণী ছিল। তাদের পরিবার একে অপরকে দল করত। কিন্তু মেয়েটির পরিবারের একটি অনুষ্ঠানে ছেলেটি লুকিয়ে ঢুকে পরে কারণ সে একটা আহাম্মক। মেয়েটা ছেলেটিকে দেখে ফেলে, এবং সে এমনভাবে আন্দোলিত হয় যে মুহূর্তেই ছেলেটির প্রেমে পরে যায়। ছেলেটি লুকিয়ে মেয়েটার বাগানে চলে আসে। তারা ঠিক করে, পরদিনই বিয়ে করবে। কেনই বা করবে না, তাদের পরিবার একে অপরকে খুন করতে চায়, এত তাড়াহুড়ো করাটা অস্বাভাবিক কিছু না। তাদের পরিবার বিয়ের খবরটি জেনে ফেলে। রাগে ফেটে পড়ে দুপক্ষই। ছেলেটির এক বন্ধু এই কলহে মারা যায়। রোমিও-জুলিয়েটে যেভাবে মারকুশিও মারা গিয়েছিল।

মেয়েটি এত হতাশায় ভেঙে পড়ে, সে একধরণের ওষুধ পান করে ফেলে। এই ওষুধ পান করলে দুদিন আগে ঘুম ভাঙে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই তরুণ দম্পতির তখনো বিয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি হয়নি, একে অন্যকে সবকিছু বলার মানসিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার ফলে মেয়েটি তার নব্য স্বামীকে ওষুধ পানের কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিল। ছেলেটি তার স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে ভাবে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটিও ভগ্ন হৃদয়ে আত্মহত্যা করে, যাতে পরকালে দুজন এক হতে পারে। দুদিন পর যখন মেয়েটি জ্ঞান ফিরে দেখে স্বামী আত্মহত্যার করেছে, সেও পরকালে মিলিত হবার চিন্তায় একই কাজ করে বসে, আত্মহত্যা। ব্যস। কিসসা খতম!

বর্তমান সংস্কৃতিতে রোমিও এবং জুলিয়েট রোমান্সের অপর নাম। এটি ইংরেজী সাহিত্যের অমর সৃষ্টি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে, আবেগনির্ভর যে কোন কাজের জন্য রোমি-জুলিয়েট সবার আদর্শ। আপনি যদি গল্পটিকে ঠিকমতো লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ছেলেমেয়ে উভয়েরই মাথা খারাপ। তারা জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছে!

অনেক সমালোচক মনে করেন শেক্সপিয়র প্রেমের উপাখ্যান হিসেবে রোমিও এবং জুলিয়েট লেখেননি। তিনি বরং ব্যঙ্গাত্মক রচনা হিসেবে লিখেছিলেন। প্রেমের মাহাত্ম্য নয় বরং এর বিপরীতে লিখেছিলেন। প্রেমে পড়ার সতর্কবাণী হিসেবে। যেন গল্পটা জ্বলজ্বল করে বলতে চাইছে- 'দূরে থাকুন'! আর এগোবেন না।

মানব ইতিহাসে প্রেমের গল্প এখনকার মতো এত সমাদৃত আর কখনো হয়নি। এমনকি উনিশ শতকের দিকেও প্রেমকে দেখা হতো অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক মানসিক বাধা হিসেবে। এর থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে- যেমন ভালোমতো কৃষিকাজ করা, ভেড়া চরানো। প্রেমের থেকে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বিয়ে হতো, এতে করে তারা পরিবার নিয়ে সুখে থাকতে পারত।

কিন্তু এটাই এখন সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যত বেশি নাটকীয়তা, তত বেশি আবেদন। এই যেমন বেন অ্যাফ্লেক তার প্রেমিকার জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করতে গ্রহাণু ধ্বংস করতে ছুটে যায়। অথবা মেল গিবসন তার নির্যাতিতা স্ত্রীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে অসখ্য ইংরেজকে হত্যা করে, শেষে নিজে অবর্ণীয় কষ্টের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়। কিংবা লর্ড অফ দ্য রিংসের আরওয়েন নিজের অমরত্ব বিসর্জন দেয় প্রেমিক অ্যারাগনের জন্য।

এই সমাজে প্রেমটা যদি কোকেইন হতো, আমরা সবাই তখন স্কারফেসের টনি মন্টানার মতো করতামঃ কোকেইনে বুঁদ হয়ে চিৎকার করে বলতাম 'সে হ্যালো টু মাইলি'ল ফ্রেন্ড'!

সমস্যা হলো, প্রেমের প্রতি আমরা অনেকটা কোকেইনেরমতো আসক্ত হয়ে পড়ছি।তাদের মধ্যে ভয়াবহ রকমের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, তারা মস্তিষ্কের একই অংশকে উত্তেজিত করে তোলে। আপনাকে কিছু সময়ের জন্য উদ্বেলিত করে তুললেও, নানা রকম সমস্যাও তৈরি করে।

ভালোবাসায় যেসব ব্যাপার আমরা খুঁজে বেড়াই-নাটকীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ, উত্থান-পতন, প্রেমের নিদর্শন দেখানো এসব কিছুই মনের জন্য শুভ ফল বয়ে আনে না। এগুলো হচ্ছে স্রেফ মনের ভ্রান্তি ।

জানি, আমার কথা শুনতে ভালো লাগছে না। কোন মানুষ ভালোবাসার কথা শুনলে নাক সিটকায়? আচ্ছা আগে আমার কথাটা শুনুন।

সত্যি হল, প্রেমে সুখকরএবং ক্ষতিকর দুটি অংশই আছে। দুজন মানুষ যখন তাদের সমস্যাগুলো একে অপরের প্রতি আবেগ দিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়, তা হলো ক্ষতিকর।

অন্যভাবে বললে, তারা একজন আরেকজনকে ব্যবহার করছে সমস্যা থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্য। আর যখন তারা নিজেদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে, একে অপরকে সাহায্য করে, তা হলো প্রেমের সুখকর অধ্যায়।

সুখকর এবং ক্ষতিকরের পার্থক্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ ১) সম্পর্কে মানুষ দুজন কতখানি দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এবং, ২) প্রত্যাখ্যাত হওয়ার এবং প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছে দুজনের আছে কিনা।

ক্ষতিকর সম্পর্কে, দুপক্ষের দায়িত্ববোধের অভাব দেখা দেয়। প্রত্যাখ্যাত হবার এবং করার মানসিকতার উপস্থিতি থাকে না সেখানে। আর অন্যদিকে সুখকর সম্পর্কে সবসময়ই সীমারেখা থাকবে দুজনের মূল্যবোধের মাঝে। যেখানে 'না' করতে বাধবে না কারোরই।

'সীমারেখা' বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি দুজন মানুষের মাঝে যার যার সমস্যার দায়িত্বের সীমানা থাকা। সুখকর একটা সম্পর্কে যে যার মূল্যবোধ আর সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে, একজনের সমস্যায় অন্যজন নাক গলাবে না। কারণ সেটা করা তার দায়িত্ব না। ক্ষতিকর সম্পর্কে দুর্বল সীমারেখা থাকে, যেখানে নিজের সমস্যা সমাধানে মন না দিয়ে সঙ্গীর দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেয় মানুষ। দুর্বল সীমারেখা আসলে কেমন? কিছু উদাহরণ দেয়া যাক-

"তুমি আমাকে ছাড়া বন্ধুদের সাথে বেরোতে পারবে না। জানোই তো আমার সহ্য হয় না। তোমাকে আমার সাথে বাড়িতেই থাকতে হবে।"

"আমার সহকর্মীরা উজবুক; ওদের কাজ শেখাতে গিয়ে সবসময় আমার মিটিঙে যেতে দেরি হয়।"

"তুমি আমার বোনের সামনে আমাকে এভাবে অপমান করলে কেন। ওর সামনে কখনও আমার সাথে দ্বিমত করবে না!"

"মিলওয়াকিতে চাকরিটা নিতে চাচ্ছি। কিন্তু এত দূরে গেলে মা আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।"

"আমি তোমার সাথে ডেটে যেতে রাজি আছি কিন্তু আমার বান্ধবী সিন্ডিকে বলো না, ও নিজেকে নিয়ে সংশয়ে ভোগে যখন ও দেখে আমার বয়ফ্রেন্ড আছে আর ওর নেই।"

প্রতিটি ক্ষেত্রেই, একজন আরেকজনের সমস্যা/আবেগের দায়িত্ব নিচ্ছে। অথবা চাচ্ছে অন্য কেউ তাদের সমস্যা/আবেগ এর দায়িত্ব নিক।

এ ধরণের মানুষরা নিজের অজান্তেই দুটো ফাঁদের যে কোন একটায় পা দিয়ে বসে। হয় তারা চায় অন্যরা তাদের সমস্যার দায়িত্ব নিকঃ ছুটির দিনটাতে আমি বাসায় থাকতে চাচ্ছিলাম। তোমার জানা উচিত ছিল, অন্য পরিকল্পনা বাদ দিতে পারতে।অথবা তারা অন্যের সমস্যার অতিরিক্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়- 'ওর স্বপ্নের চাকরিটা আবারো হাত ছাড়া হলো, আমার দোষ থাকতে পারে কারণ আমার আরও সাহায্য করা উচিত ছিল। কালকেও ওকে সিভি লিখতে সাহায্য করবো'

সম্পর্ক গড়ার সময় অনেকেই এই কৌশলটা বেছে নেয়। কেবল সম্পর্ক না, অন্যসবকিছুতেও এই কৌশলের অপপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ তাদের সম্পর্কগুলো হয় ভঙ্গুর। জীবনসঙ্গীকে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার বদলে তারা পালিয়ে বেড়ায় কষ্টের হাত থেকে।

এটা শুধু প্রেমের সম্পর্কে নয়, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও সত্যি। অতি কর্তৃত্বপরায়ু মা তার সন্তানের সকল সমস্যার দায়িত্ব নেয়। তার এই অভ্যাসের ফলে একসময় তার সন্তানের মাঝেও ধারণা ঢুকে যায় যে অন্যসবার দায়িত্ব হচ্ছে তার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরেও এই মনোভাবে পরিবর্তন আসে না।

(এ কারণেই ভালোবাসার সম্পর্কের সমস্যাগুলোতে বাবা-মার সম্পর্কের সমস্যার সাথে ভয়ানক ভাবে মিলে যায়।)

যখন আবেগ এবং কর্মের প্রতি আপনার দায়িত্ববোধ অস্পষ্ট থাকে- যেখানে কে কীসের জন্য দায়ী বোঝা মুশকিল, কার ভুল কোনটি, আপনি যা করছেন তার কারণ কী, এসবের ভিড়ে কখনোই দৃঢ় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবেন না।একমাত্র মূল্যবোধ যেটা তৈরি হয় সেটা হলো সঙ্গীকে সর্বদা খুশি রাখার ইচ্ছে। কিংবা আপনার সঙ্গী সবসময় আপনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে, এমন প্রত্যাশা তৈরি হয়ে যায়।

অবশ্যই এটা নিজেকে বোকা বানানো। এরকম অস্পষ্টতার সম্পর্কগুলো জার্মান এয়ারশিপ হিন্ডেনবার্গের মতোই মাটিতে আছড়ে পড়ে।

আপনার সমস্যাগুলো অন্য কেউ সমাধান করতে পারবে না। তাদের চেষ্টা করারও দরকার নেই, কারণ তা আপনাকে সুখী করবে না। একইভাবে আপনিও অন্যের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন না, কারণ তা তাদের সুখী করবে না। সুখী রাখার জন্য একে অন্যের সমস্যা সমাধান করছে, এটাই ক্ষতিকর সম্পর্কের লক্ষণ। অন্যদিকে, একে অন্যকে সুখী করার জন্য নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করছে-এমনটা হলে সেটা সুখকর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

সীমারেখা তৈরির মানে এই নয়, যে আপনি আপনার সঙ্গীকে সাহায্য করতে পারবেন না অথাব সাহায্য নিতে পারবেন না। কিন্তু অবশ্যই আপনার নিজেকে বেছে নিতে হবে। আপনি এক্ষেত্রে নিজেকে বাধ্য ভাবতে পারেন না।

যে সব মানুষ নিজেদেও আবেগ আর কর্মেও জন্য অন্যকে দায়ী কওে তারা বিশ্বাস করে যদি ক্রমাগত এই কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে কখনো না কখনো কেউ এগিয়ে আসবেই তাদেও রক্ষা করতে। তাদেও প্রাপ্য অধিকার বুঝে নেবে সেই রক্ষা কর্তার হাত থেকে।

যারা অন্যেও আবেগ আর কর্মেও জন্য নিজেকে দায়ী কওে তারা বিশ্বাস কওে যদি আসলেই তার সঙ্গীর সমস্যাকে সমাধান করে ফেলতে পারে তাহলে তারা পুরস্কৃত হবে আদর আর ভালোবাসায়।

ক্ষতিকর সম্পর্কেও এই হচ্ছে সাদা আর কালোর অংশ, অসহায় আর তার ত্রাণকর্তা। যে মানুষটা বিপদে ঝাঁপ দেয় সে মনে কওে এতে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর যে ব্যক্তি এগিয়ে এসে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে, সে মনে করে এতে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলো।

এ দুই ধরণের মানুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলোও একে অন্যের সাথে খাপ খায় । হয়তোবা তাদের বাবা-মার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে একটা 'সুখী' সম্পর্কের সংজ্ঞা তৈরিই হয় দুর্বল সীমারেখার উপর ভিত্তি করে।

দুঃখজনক হলো, তারা একে অন্যের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে পারে না তাদের দোষারোপ করা আর দোষ স্বীকার করার প্রবণতা বরং আত্মসম্মানকে আরো নিচে নামিয়ে দেয়। ঠিক যে কারণে আগে থেকেই তারা অসুখী ছিল, সেটাকেই উস্কে দেয়া হয় এই আচরণের মাধ্যমে। প্রতারিত ব্যক্তি আরো সমস্যা তৈরি করে সমাধানের জন্য। এমন না যে, সে নতুন ভাবে উঁকি দেয়া বিপদের মুখে পড়েছে আর সেখান থেকে উদ্ধারের পথ নেই। অহেতুক সমস্যায় জড়িয়ে লাভ একটাই হয়,অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। অন্যের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে ভালোবাসে মানুষ। আর রক্ষাকর্তাও একের পর এক সমস্যা সমাধান করে যেতে থাকে। তার বিশ্বাস, সে সমাধান করে যেতে থাকলে এক সময় না এক সময় কারো মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে। এক্ষেত্রে বলা যায় বিপদের শিকার আর রক্ষাকর্তা, দুই পক্ষের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অসৎ, স্বার্থপর আর শর্তসাপেক্ষ। দুজনেই মনোযোগ আকর্ষনের লোভে পথ চলছে। আর এতকিছুর ডামাডোলে সত্যিকারের ভালোবাসার স্বাদ কখনোই পাওয়া হয় না কারোরই।

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটি যদি সত্যিই তার সঙ্গীকে ভালোবেসে থাকে তাহলে সে বলবে, 'দেখো, এই হচ্ছে আমার সমস্যা। কিন্তু তোমাকে এর সমাধান করতে হবে না। শুধু আমাকে সাহস দেবে যখন আমি এর সমাধান করব। তার সেটাই হবে প্রকৃত ভালোবাসার নিদর্শন। নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শেখা, অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিয়ে।

আর তার সঙ্গীও যদিও সত্যি সত্যি তার সাথীকে উদ্ধার করতে চায়, তাহলে সে-ও বলবে, দেখো, নিজের সমস্যার জন্য তুমি অন্যদের দোষ দিচ্ছো।

তোমার উচিত নিজের হাতে একে সামাল দেয়া। উদ্ভট হলেও এটাও হচ্ছে ভালোবাসার চিহ্ন, সমস্যা সমাধানে অন্যকে উৎসাহ দেয়া।

কিন্তু এর জায়গায়, বিপদের শিকার আর রক্ষাকর্তা দুজনেই দুজনের আবেগ রক্ষার জন্য ব্যবহার করছে।

ব্যাপারটা অনেকটা নেশার মতো দুজনের কাছেই। যদি কখনো তাদের স্বাভাবিক মানুষের সাথে ডেটে যেতে বলা হয়, তারা একঘেয়ে অনুভব করে। ভাবে এই মানুষটার সাথে তার কোন 'রসায়ন ই নেই। সুস্থ-স্বাভাবিক, ব্যক্তিগতভাবে সংশয়হীন মানুষদের তারা এড়িয়ে যাবে। কারণ সেসব সংশয়হীন মানুষদের সীমারেখায় কোন উত্তেজনা লুকিয়ে নেই।

যে পরিস্থিতির শিকার হয় আর জন্য কঠিনতম কাজ হলো নিজের সমস্যার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করা। কারণ সারাজীবন সে বিশ্বাস করে এসেছে তার ভাগ্যের জন্য সে নিজে নয়, বাকি সবাই দায়ী। দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নেয়ার ধারণাটাই তাদের জন্য আতঙ্কজনক ।

আর রক্ষাকর্তার জন্য কঠিনতম কাজ হলো অন্যের সমস্যা নিজের ঘাড়ে নেয়ার প্রবণতা বন্ধ করা। কারণ তারা মনে করে, তাদের মূল্যায়ন করা হয়, ভালোবাসা হয় তাদের সামর্থ্যের জন্য। অন্যকে সাহায্য করছে। শুধুমাত্র তার পুরস্কারস্বরূপ পাচ্ছে এসব। এই প্রবণতা থেকে সরে আসার চিন্তা করাও তাদের কাছে ভীতিজাগানিয়া।

আপনি পছন্দ করেন মনে মনে, এমন কারো জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করেন; তাহলে আপনি এমনটা করছেন কারণ আপনি চাইছেন মনে-প্রাণে এমনটা করতে। দায়বদ্ধতা থেকে কিংবা ত্যাগ স্বীকার না করলে কী হবে, এমন চিন্তা থেকে ত্যাগ স্বীকার করাটা উচিত নয়। আপনার সঙ্গী যদি আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তাহলে সেটা করা উচিত নিখাঁদ ইচ্ছেশক্তির বলে। আপনি তাকে বাধ্য করছেন বলে নয়। ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পায় যখন তাতে কোন শর্ত থাকে না।

কিছু কিছু মানুষ এই দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করা আর ইচ্ছেমাফিক কাজ করার পার্থক্যটা বোঝে না। এরজন্য একটা পরীক্ষা চালানো যাক। নিজেকে প্রশ্ন করুন,যদি আমি ফিরিয়ে দিই, তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের সম্পর্কে কী ধরণের পরিবর্তন আনতে পারে?একইভাবে জিজ্ঞেস করুন,যদি আমার সঙ্গী এমনকিছু নিতে অস্বীকার করে যেটা আমি নিতে চাইছি, তাহলে আমাদের সম্পর্ক কি বদলে যাবে এর ফলে?

যদি উত্তরটা এমন এমন হয় যে, প্রত্যাখ্যান করলে আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে, তাহলে সতর্ক হোন। বুঝতে হবে আপনাদের সম্পর্কটা শর্তাধীন। একে অন্যের কাছ থেকে কি সুবিধা পাচ্ছেন সেটার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সম্পর্ক। নিঃশর্তে একে অপরকে গ্রহণ করছেন না (গ্রহণ করছেন না অপরের সমস্যাগুলোকেও)।

সীমারেখার সুস্পষ্টতা যাদের আছে তারা কখনোই মনোমালিন্যকে ভয় পায় না, তর্কে জড়াতেও পিছপা হয় না কিংবা কষ্ট পেতে হলেও পিছিয়ে যায় না। যাদের সীমারেখা দুর্বল তারা এসব ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকে আর পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের রূপ বদলে ফেলে।

যেসব মানুষের সীমারেখার দুর্বলতা নেই তারা জানে দুজন মানুষের পক্ষে সম্পর্কে সবসময় ১০০% দেয়া সম্ভব না, কখনো কখনো মানুষকে আঘাত করে ফেললেও অন্যের আবেগের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। স্পষ্ট সীমারেখা সম্পন্ন ব্যক্তিরা বোঝে, একটা সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্কের মানে একে অন্যের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং একে অন্যকে সাহায্য করার মাঝে আছে বিকাশের সুযোগ, আছে সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

সম্পর্ক রক্ষার মানে এই না সঙ্গীর মাথাব্যথাকে নিজের মাথাব্যথায় পরিণত করতে হবে। মাথাব্যথা করতে হবে সঙ্গীর জন্য, তার সমস্যা না। তার সমস্যা, তার মাথাব্যথা। আর এটাই হচ্ছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

কীভাবে বিশ্বাস তৈরি করতে হয়

আমার স্ত্রী আয়নার সামনে অনেক সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে নিজেকে সুন্দরভাবে দেখতে ভালোবাসে। তাকে অসাধারণ দেখালে আমারও ভালো লাগে (যেটা হওয়াটা স্বাভাবিক)।

রাতে কোথাও বের হবার আগে, সে বাথরুম থেকে ঘণ্টাব্যাপী সময় কাটিয়ে বের হয়। মেকআপ এবং চুল ঠিক করে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে। জিজ্ঞেস করবে তাকে কেমন দেখাচ্ছে। এমনিতে সে দেখতে চমৎকার। যদিও মাঝে মাঝে তাকে দেখতে ভালো লাগে না। হয়তোবা সে নতুন কিছু করেছে অথবা কোন ডিজাইনারের তৈরি অতি জাঁকালো জুতো পরেছে। যে কারণেই হোক, তার সাথে মিলেনি।

তাকে এ কথা বললে, সে মন খারাপ করে। বাথরুমে গিয়ে সে আমাদের আরও ত্রিশ মিনিট সময় নষ্ট করে, সাজসজ্জা ঠিকঠাক করতে করতে আমার উদ্দেশ্যে অগ্নিবর্ষণ করতে থাকে।

পুরুষরা সাধারণত গার্লফ্রেন্ড/স্ত্রীকে খুশি করতে এসব ব্যাপারে মিথ্যে বলে। কিন্তু আমি তা করি না। কেন? কারণ আমার কাছে সম্পর্কে খুশি থাকার থেকে সততা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে মহিলাকে আমি ভালোবাসি, তার সামনে ভণিতা করার প্রশ্নই উঠে না।

আমার সৌভাগ্য, আমার স্ত্রী আমার চাঁছাছোলা কথা শুনতে আপত্তি করে না। সে আমার কথার ভুল ধরতেও পটু। আমার সঙ্গী হিসেবে তার এই আচরণ আমাকে মুগ্ধ করে। মাঝেমাঝে আমার বিরক্তিও লাগে, আমিও পাল্টা যুক্তি দিই, কিন্তু পরে মাথা নেড়ে স্বীকার করি, সে-ই সঠিক ছিল। সে আমাকে মানুষ হিসেবে আরও পরিপূর্ণ করেছে।

সবসময় ফুরফুরে মেজাজে থাকা প্রধান লক্ষ্য হলেঅথবা আমাদের সঙ্গীকে খুশি রাখতে চাইলে, দিনশেষে কেউই সুখী হয় না। মনের অজান্তেই সম্পর্কে ফাটল ধরে।

সংঘাত ছাড়া, বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। সংঘাতেই বোঝা যায়, কে শর্তহীনভাবে আমাদের পাশে থাকে, এবং কে লাভের গুড়টুকু খেতে এসেছে। জি হুজুর করা মানুষকে কেউই বিশ্বাস করে না। নিরাশকারী পান্ডা যদি এখানে থাকতো তাহলে সে বলতো, সম্পর্কের ঝামেলাগুলো আমাদের বিশ্বাসকে আরও একাট্য করে।

সুসম্পর্কের জন্য পছন্দ এবং অপছন্দ দুই ধরনের বক্তব্যই শোনার মানসিকতা থাকা দরকার। সংঘাত স্বাভাবিক জিনিস; এমনকি সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অত্যাবশকীয়। দুজন মানুষ কাছাকাছি থাকার পরেও যদি তাদের পার্থক্য নিয়ে উন্মুক্তভাবে কথা বলতে না পারে, তবে তাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠে ।

যে কোন সম্পর্কের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া সম্পর্কের কোন মূল্যই নেই। আপনাকে হয়তো কোন মেয়ে প্রেম নিবেদন করল, আপনার জন্য সে সবকিছু করতে পারে, কিন্তু আপনি যদি তাকে বিশ্বাস করতে না পারেন তাহলে ওসব বক্তব্যের কোন দামই থাকল না। আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসা অনুভব করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারবেন এই ভালোবাসা আসলেই নিঃস্বার্থ নাকি এর পিছনে কোন কারণ লুকিয়ে আছে।

প্রতারণার ভয়াবহতাটাই এখানে। শুধু বিছানায় উদ্দামতাই সব না, শরীর বিনিময়ের ফলে যে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে সেটাই মুখ্য। বিশ্বাস ছাড়া সম্পর্কটা আর সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। নতুন করে বিশ্বাস গড়ে তুলতে না পারলেদুজনের চলার পথও আলাদা হয়ে যায়।

প্রতারণার শিকার হয়েছে এমন অনেকের কাছ থেকেই আমি ইমেইল পাই। প্রতারিত হবার পরেও তারা সঙ্গীকে ছাড়তে অনিচ্ছুক, আবার বুঝতেও পারছে না কীভাবে আবার বিশ্বাস করতে পারবে তাকে। বিশ্বাসবিহীন সম্পর্কটাকে সেয় বোঝা মনে হচ্ছে। যেন বিপদজনক দ্রব্যকে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। উপভোগ করা তো দূরের কথা।

সমস্যা হচ্ছে, যারা প্রতারণা করে ধরা পড়ে তারা ক্ষমা চেয়ে মুখস্ত বুলি আউড়ে যায়। আর কখনো এমনটা হবে না। ব্যস সেখানেই শেষ। যেন যা হয়েছে, না বুঝে হয়েছে। আর যারা প্রতারণার শিকার, তারা প্রতারকের মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে না অনেক সময়। নিজেদের জিজ্ঞেস করে না তাদের প্রতারক সঙ্গীর মূল্যবোধের মান আসলে কতটুকু। আদৌ তার সাথে সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কিনা এ-ও চিন্তা করে না। যা-ই ঘটুক না কেন সম্পর্ক জিইয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মগ্ন হয়ে পড়ে। অথচ খেয়াল করে না এই অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার ফলে তাদের আত্মসম্মানই থাকছে না।

যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করেই ফেলে, এর মানে দাঁড়াচ্ছে তার কাছে সম্পর্কের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ অন্যকিছু রয়েছে। হতে পারে অন্যের উপর ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়াস থেকেই করেছে। যেটা বহিঃপ্রকাশের জন্য যৌনতা একটা উপায় মাত্র। যা-ই হোক না কেন, এটা পরিস্কার যে প্রতারকের কাছে সুন্দর সম্পর্কের কোন মূল্যই নেই। আর যদি সে সেটার দায় স্বীকার না করে দায়সারা 'আমি আসলে বুঝে উঠতে পারিনি কী করছিলাম। অনেক চাপের মধ্যে ছিলাম, মাতালও। আর মেয়েটাও সেখানে ছিল। জাতীয় উত্তর দেয় তাহলে বুঝে নিতে হবে তার মাঝে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখাকেও সে আর গুরুত্ব দিচ্ছে না।

যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে, প্রতারকের উচিত আত্মসচেতনতা রূপী পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো শুরু করা। যাতে বুঝতে পারে ঠিক কোন ভুল মূল্যবোধের জন্য আজকে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে (আর তারা সম্পর্কটাকে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা)। তাদের উচিত এমনটা বলা,আমি স্বার্থপর একটা মানুষ। আমাদের দুজনের সম্পর্কের চাইতে নিজেকে বেশি গুরুত্ব দিই। সত্যি বললে এই সম্পর্কের কোন মূল্যই নেই আমার কাছে।' যদি তারা নিজেদের কলুষিত

মূল্যবোধকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে কোন কারনই নেই তাদের আবার বিশ্বাস করার। আর যদি তাদের বিশ্বাস না-ই করা গেল, তাহলে এই সম্পর্কের কোন উন্নতি হবে না, অবস্থারও কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার পুরোপুরি বাস্তবসম্মত একটা উপায় আছে। সেটা হলো, হিসেব রাখা। কথা শুনতে মধুর লাগতে পারে। কিন্তু কেউ আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করলে আপনার উচিত তার আচার-আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব রাখা। শুধু মাত্র তখনই আপনি তাকে ধীরে ধীরে ছাড় দিতে পারবেন। বুঝতে পারবেন তার মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে, সে বদলাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে অনেক সময় লেগে যায়। এই বিশ্বাস পুনরায় নির্মাণ চলাকালীন সময়টা খারাপ যেতেই পারে। সুতরাং সম্পর্কে জড়িত ব্যক্তি দুজনকেই তাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

আমি ভালোবাসার সম্পর্কের উদাহরণ দিচ্ছি, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা যে কোন সম্পর্ক জোড়া লাগানোর সময় ব্যবহার করা যায়। বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেলে, দুটো ধাপে আবার গড়ে নেয়া যায়- ১) প্রতারককে স্বীকার করতে হবে ঠিক কোন কারণে সে এমনটা করছে, ২) বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে লক্ষ্যণীয়ভাবে তার আচার- আচরণের ক্রমাগত উন্নতি ঘটাতে হবে। প্রথম ধাপ পালন না করলে মিটমাটের প্রশ্নই আসে না।

বিশ্বাস চায়না প্লেটের মতো। একবার ভাঙলে টুকরোগুলোকে জোড়া লাগাতে পারবেন। আরেকবার ভাঙলে ভাঙা টুকরোর সংখ্যা বেড়ে যাবে, জোড়া লাগানোটাও কঠিন হয়ে পড়বে। এরপরেও যদি ভেঙে ফেলেন তাহলে জোড়া লাগানো অসম্ভব। ভেঙে যাওয়া টুকরো আর ধুলোবালি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

অঙ্গীকারেই মুক্তি নিহিত

ভোগবাদী সংস্কৃতি আমাদের চাহিদা বাড়িয়েই চলেছে। আমিও অনেক বছর এ ধারণায় আটকে ছিলাম। অনেক টাকা আয় করো, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করো, মেয়েদের সাথে ঘুরে বেড়াও।

প্রাচুর্যের মানেই সুখ নয়। এমনকি, এর বিপরীতটাই সঠিক। কম পেয়েই আমরা সুখে থাকি। যখন আমাদের হাতে অবারিত সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকে, আমরা মধুর সমস্যায় পড়ি, মনোবিদরা এক বেছে নেয়ার গোলকধাঁধা বলেন।

আসলে অতিরিক্ত সুযোগ পেলে, আমরা বাছাই করা জিনিস নিয়ে আরো কর সন্তুষ্ট হই। কারণ বাদ দেয়া সুযোগ সম্পর্কেও আমরা অবগত থাকি।

আপনাকে যদি থাকার জন্য দুটি জায়গার একটি বেছে নিতে বলা হয়, আপনি সহজেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং সে সিদ্ধান্তকে সঠিক ভাববেন।

আপনাকে যদি থাকার জন্য আঠাশটি জায়গার একটি বেছে নিতে বলা হয় 'বেছে নেয়ার ধাঁধা;র নিয়মঅনুযায়ী, আপনি বছরের পর বছর ভেবে ভেবে হয়রান হবে, আসলেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে ছিলেন কিনা। এবং এই উদ্বেগ, নিখুঁত সিদ্ধান্ত এবং সাফল্যের এই আকাঙ্ক্ষা আপনাকে অসুখী করে তুলবে।

তো আমরা কী করব? আমার মতো করে ভাবলে, আপনি কিছুই বাছতে যাবেন না। বিকল্পগুলো যতক্ষণ সম্ভব জিইয়ে রাখবেন। আগেই কোন অঙ্গীকার করতে যাবেন না।

কিন্তু নির্দিষ্টএকজন মানুষের কাছে, জায়গায় বাকাজে নিজেকে উৎসর্গকরে দেয়ার মানে হচ্ছে নিজেকে অবারিত অভিজ্ঞতার হাত থেকে বঞ্চিত করা। আবার একাধিক অভিজ্ঞতার পেছনে ছুটলে আমরা কখনোই গভীর ভাবে নির্দিষ্ট একটা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব না। এমন অনেক জ্ঞান আছে যা শুধু এক জায়গায় পাঁচ বছর থাকলে, একই মানুষের সাথে দশ বছর থাকলে, অথবা একই কাজে জীবনের অর্ধেক সময় পার করলে লাভ করতে পারবেন। আমার বয়স এখন ত্রিশ চলে, আমি এখন এ ধরণের অঙ্গীকার করার মানে বুঝতে পারি। এই অঙ্গীকার এমন অনেক সুযোগ আর জ্ঞান নিয়ে আসে যেটা আমি কখনোই পেতাম না। যত যা-ই করি না কেন বা যত জায়গায়ই যাই না কেন।

আপনি যখন একের অধিক অভিজ্ঞতার পেছনে ছুটবেন, তখন প্রত্যেকটা নতুন অভিজ্ঞতা, প্রতিটি নতুন মানুষের পরিচয় হবার কিংবা নতুন জিনিস জানার আগ্রহ ততই কমতে থাকবে আপনার। অর্থনীতিতে একে 'ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্ন বলা হয়।

আপনি কখনোই দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাননি। এখন প্রথম যে দেশে যাবেন সেখানে গিয়ে আপনার মাঝে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হবে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে। কারণ, এতদিন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু ধরুন আপনি বিশটি দেশ ভ্রমণ করেছেন, একুশ নাম্বারে ভ্রমণের সময় আহামরি কিছু মনে হবে না। পঞ্চাশটা দেশ ঘুরলে, একান্ন নাম্বার দেশ ঘোরার সময় ভালো না-ও লাগতে পারে।

বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টাকা-পয়সা, শখ-আহ্লাদ, চাকরি, বন্ধু-বান্ধব, ভালোবাসার মানুষটা-এসব কিছুই। আপনার যতই বয়স বাড়বে ততই অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারি হবে। আর ততই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার উপর কম প্রভাব ফেলবে। পার্টিতে প্রথমবার মদ গেলার সময় আমার মাঝে উত্তেজনা কাজ করছিল। একশতম বার মদ পানের সময় ভালোই লেগেছিলো | পাঁচশতম বারের মতো যখন গিলি, মনে হচ্ছিল খুব সাধারণ কিছু করছি। আর হাজারবারের মতো চুমুক দেয়ার সময় মদপানকে একঘেয়ে, গুরুত্বহীন লাগছিল।

গত কয়েকবছরে আমার বলার মতো অর্জন হচ্ছে অঙ্গীকার করতে শেখা। পছন্দের মানুষ আর অভিজ্ঞতা-মূল্যবোধ ছাড়া বাকি সব কিছুকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। সমস্ত ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে লেখালেখিতে মনোযোগ দিয়েছি। এরপর থেকেই আমার ওয়েবসাইটের জনপ্রিয়তা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। ভালোবেসেছি এক নারীকেই । আর অবাক হলেও সত্যি, এতদিনের উদ্দাম জীবন আর একের পর এক নারীসঙ্গ উপভোগের চাইতে এই সম্পর্কই মধুর আমার কাছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় থিতু হয়েছি, বন্ধুত্বের উপর জোর দিতে শিখেছি।

আমি একটা ব্যাপার উপলব্ধি করেছি। প্রথাগত বুলির চেয়ে একটু বিপরীতধর্মী শোনালেও সত্যি, অঙ্গীকারের মাঝেই আছে মুক্তি।

অঙ্গীকার আপনাকে স্বাধীনতা এনে দেয়, কারণ আপনার আর বিভ্রান্ত হবার সুযোগই নেই। এতে আপনার মনোযোগ দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়। আপনার জন্য যেটা কল্যাণকর সেটার দিকে ধাবিত করে। সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে আর দ্বিধাবোধ হয় না। আপনার যা আছে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছেন। আরো বেশি কিছুর পেছনে ছোটার দরকার কী? অঙ্গীকারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে পাখির চোখ করতে পারবেন। যা বয়ে আনবে সাফল্য।

বিকল্পকে প্রত্যাখ্যানেই আছে সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ। যেটা আপনার মূল্যবোধ আর তার মানদন্ডের সাথে খাপ খায় না সেটাকে ফিরিয়ে দেয়াতেই আছে আনন্দ।

অল্প বয়সে মনে হতে পারে, যত বেশি অভিজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করা যায় তত লাভ। অবশ্য, একসময় না একসময় আপনাকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বুঝতে হবে কীসে আপনি দক্ষ। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য হচ্ছে গুপ্তধনের মতো, আপনাকে গভীরে গিয়ে দেখতে হবে কোথায় লুকানো আছে সেই সম্পদ। এমনটা করতে হবে সব ব্যাপারেই। সেটা হোক সম্পর্কে, পেশায় কিংবা জীবনযাপনের ধরন বেছে নেয়ার সময়।

অধ্যায় ৯

...অতঃপর আপনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন

'সত্যের অন্বেষণ করো, তোমার সাথে আমার দেখা হবে সেখানেই।'

এটাই ছিল আমাকে বলা জসের শেষ কথা। কথাটা গভীরভাবে বলা আসলে অন্যদের বলার ভঙ্গিকে খোঁচা মারার চেষ্টা করছিল। শোয় ছিল সেসময়। ও আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল।

উনিশ বছর বয়সে আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনে দেয়া ঘটনা ঘটে। জস আমাকে ডালাসের উত্তর দিকে অবস্থিত এক লেকের পার্টিতে নিয়ে যায়। পাহাড়ের উপরে নির্মিত ভবন, পাহাড়ের গোড়ায় সুইমিং পুল আর পুলের নিচেই খাঁড়ি নেমে গেছে লেকে। খাঁড়িটা ত্রিশ ফুটের মতো হবে। অবশ্যই ওখান থেকে লাফ দেয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে। অবশ্য পেটে অ্যালকোহল পড়লে আর উত্তেজিত জনতার উৎসাহ পেলে দ্বিতীয়বার চিন্তা করার দরকার না ও হতে পারে।

পার্টিতে পৌঁছেই জস আর আমি পুলে নেমে পড়ি। বিয়ার গিলতে গিলতে গল্প করছিলাম। মেয়ে, পানীয়, মিউজিক স্কুল ছাড়ার পর গ্রীষ্মে জসের মজার ঘটনা নিয়ে গল্প করছিলাম। নিউ ইয়র্কে গিয়ে একসাথে ব্যান্ড করার কথাও বললাম, সে সময়ের অসম্ভব একটা স্বপ্ন।

নেহাত কিশোর ছিলাম আমরা।

কিছুক্ষণ পর লেকের দিকে তাকিয়ে বললাম,এখান থেকে তো লাফ দেওয়া যাবে।

হুম, লোকেরা সব সময়ই দেয়।জস বললো।

' তুমি কি দেবে?'

'দিতে পারি, দেখা যাক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো সে।

বিকেলের দিকে আমি জসের থেকে আলাদা থাকলাম। একটা সুন্দরী এশিয়ান মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। মেয়েটা ভিডিও গেমস পছন্দ করত। আমার জন্য ব্যাপারটা খুবই উত্তেজনার ব্যাপার ছিল। আমার প্রতি এর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মেয়েটা মিশুক স্বভাবের, তো ওর সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম। কয়েকটা বিয়ার গেলার পরসাহস করে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি

উপরের ঘরে গিয়ে আমার সাথে খাবার নিয়ে আসবে কিনা। মেয়েটাও রাজি হলো।

ঢাল বেয়ে ওঠার পথে জসের সাথে দেখা হলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম কিছু খাবে কিনা। না করে দিল। জিজ্ঞেস করলাম পরে ওকে কোথায় পাবো।জস হেসে বললো, সত্যের অন্বেষণ করো, তোমার সাথে আমার দেখা হবে সেখানেই।

আমি মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বললাম, "ঠিক আছে, ওখানেই দেখা হবে।যেন সবাই জানে সত্যকে কোথায় পাওয়া যাবে। জসহাসি দিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে থাকল। আর আমি ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে থাকলাম ।

কতক্ষণ ভিতরে ছিলাম মনে করতে পারছি না। খালি মনে আছে মেয়েটা আর আমি যখন বের হই, আর কেউ ছিল না সেখানে, আর সাইরেন বাজছিল। পুল খালি পড়ে আছে। লোকজন লেক পাড়ের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। অনেকে পানিতে নেমেও পড়েছে। কয়েকটা ছেলেকে দেখলাম সাঁতরাচ্ছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছিল না।গান বেজে চলছেকিন্তু সেদিকে কারো মনোযোগ নেই।

তখনও দুই আর দুই মিলাতে পারিনি। স্যান্ডউইচ খেতে খেতে লেকের পাড়ের দিকে নামতে থাকলাম। সবার মতো আমিও উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছি। অর্ধেক পথ নামার পর এশিয়ান মেয়েটা আমাকে বলল, আমার মনে হয় ভয়ানক কিছু হয়ে গেছে।

পাহাড় থেকে নেমে আমি একজনকে জসের কথা জিজ্ঞেস করি। কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছিল না, আমাকে চিনতেও পারছিল না। সবাই পানির দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম। একটা মেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল ।

তখনই আমি বুঝে ফেলি কী ঘটেছে।

জশের দেহ খুঁজে পেতে স্কুবা ডাইভারদের তিনঘন্টা সময় লাগে। ময়নাতদন্ত থেকে পরে জানা যায় অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের ফলে ওর পা অসাড় হয়ে যায়। এত উঁচু থেকে লাফ দেয়ার ফলে প্রচন্ড শক্তিতে পানিতে ধাক্কা খায় ও, যার ফলে ঠিকমতো পা নেড়ে সাঁতরাতেও পারেনি। ও যখন লাফ দেয় তখন চারদিকে অন্ধকার। অন্ধকারে পানির স্তরও বোঝা যাচ্ছিল না। ওর সাহায্যের চিৎকার কোথা থেকে আসছে কারোর পক্ষেই বোঝা সম্ভব হয়নি। শুধু পানির ঝাপটার আওয়াজ পাওয়া যায়। পরে ওর বাবা-মার থেকে জানতে পারি, ও ঠিকমতো সাঁতারই কাটতে পারতো না।

বারো ঘন্টা পার হওয়ার পর আমার চোখে জল এলো। আমি অস্টিনে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। আমি বাবাকে ফোন করে জানাই, আমি তখনও ডালাসের কাছে, অফিসে যেতে পারব না (আমি বাবার সাথে ঐ গ্রীষ্মে কাজ করতাম)। বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে? সব ঠিকঠাক আছে কিনা?? আর তখনই আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। রাস্তার পাশে আমি গাড়ি থামিয়ে রাখি। শিশুর মতো বাবার কাছে ফোনে কাঁদতে থাকি।

ঐ গ্রীষ্মে আমি গভীর বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হই। আমি ভাবতাম, আমি আগেও বিষণ্ন ছিলাম, কিন্তু তখন নতুন পর্যায়ে অর্থহীন অবস্থায় পড়ি, গভীর দুঃখে শারীরিকভাবেও যেন আক্রান্ত হই। মানুষজন এসে আমাকে উৎফুল্ল করার চেষ্টা করতো। আর আমি বসে বসে কী করা উচিত সে কথা শুনতাম। আমার সাথে দেখা করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতাম। হাসি দিয়ে মিথ্যে বলতাম, আমি ঠিক আছি । কিন্তু ভিতরে আমি কিছুই অনুভব করতে পারতাম না।

কয়েকমাস পর আমি জসকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে ও আর আমি জীবন এবং মৃত্যু নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি অর্থহীন জিনিস নিয়ে আলোচনা করি। সেদিনের আগ পর্যন্ত আমি আর দশটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতোই ছিলাম। স্বভাবে অলস ছিলাম, সামাজিক মেলামেশা করতে আতঙ্কিত থাকতাম, সবসময় সংশয়ে ভুগতাম। আর জসকে নিজের আদর্শ ভাবতাম অনেক দিক দিয়ে। আমার চেয়ে বয়সে বড়ছিল ও। আত্মবিশ্বাস, অভিজ্ঞতা সবকিছুই বেশি ছিল ওর। জসকে দেখা শেষ স্বপ্নে আমি আর ও জাকুজিতে বসে ছিলাম (উদ্ভট শোনালেও এটাই দেখেছিলাম)। আমি ওকে বলি 'তোমার মৃত্যুতে কষ্ট লাগছে।ও হাসল। ঠিক কী বলেছিল, আমার তা মনে নেই। তবে ওর কথাগুলো ছিল এরকম, ;আমার মৃত্যু নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন, যেখানে তুমি বেঁচে থাকতে ভয় পাচ্ছ। কাঁদতে কাঁদতে আমি জেগে উঠি।

গ্রীষ্মকালটা আমি কাউচে বসেই কাটিয়ে দিই । নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থাকি কল্পনার অতল গহ্বরের দিকে, যেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। যেখানে একসময় জসের বন্ধুত্ব ছিল সেখানে এখন শুধুই অসীম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঠিক তখনই আমি উপলব্ধি করি, যদি আসলেই কিছু করার কোন কারণই না থাকে তাহলে তো কিছু না করারও কোন কারণ নেই। মৃত্যুই যেখানে শেষ ঠিকানা, সেখানে ভয় বা লজ্জা পেয়ে কোন লাভ নেই। কারণ দিনশেষে সবকিছুই অনর্থক। ক্ষুদ্র এই জীবনে এতদিন শুধুকষ্ট আর অস্বস্তিকে পাশ কাটিয়ে যাইনি, বরং বেঁচে থাকাকেই পাশ কাটিয়ে গেছি নিজের অজান্তে ।

ঐ গ্রীষ্মে আমি মারিজুয়ানা, সিগারেট এবং ভিডিও গেমস ছেড়ে দেই। আমার রকস্টার কল্পনা মাথা থেকে বাদ দিয়ে মিউজিক স্কুল ছেড়ে দেই।কলেজ কোর্সে নাম লেখাই। জিমে গিয়ে কয়েক কেজি ওজনও ঝেড়ে ফেলি। নতুন বন্ধু তৈরি করি। প্রথম গার্লফ্রেন্ড হয় আমার। জীবনে প্রথমবারের মতো ক্লাসের পড়া করতে থাকি, বুঝতে পারি,মনোযোগ দিলে আমিও ভালো গ্রেড তুলতে পারব। পরের গ্রীষ্মে আমি ঠিক করি পঞ্চাশ দিনে পঞ্চাশটা বই পড়ব। এবং তা পূরণও করি। পরের বছর আমি দেশের অপর প্রান্তে খুবই ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হই। ওখানে প্রথমবারের মতো আমি প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক দুই দিকে উন্নতি করি।

জসের মৃত্যু আমার জীবনের পূর্বাপরে একটা শক্ত বিভেদ রেখা। দুর্ঘটনার আগে আমার জীবনে কোন উচ্চাশা ছিল না, লোকে কী বলবে তা নিয়েই চিন্তা করতাম। দুর্ঘটনাটার পর আমি দায়িত্ববোধসম্পন্ন, উৎসুক এবং পরিশ্রমী নতুন একজন মানুষে পরিণত হই। সংশয় আর দায়িত্বের বোঝা যে ছিল না তা বলছি না, কিন্তু আমি আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করি। অদ্ভুতভাবে হলেও, আরেকজনের মৃত্যু আমাকে বাঁচার মতো বাঁচতে শিখিয়েছে। এবং হয়ত আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অধ্যায়টিই আমাকে পাল্টে দিয়েছে।

মৃত্যু আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে। এবং এ কারণেআমরা মৃত্যুর চিন্তা এড়িয়ে চলি, তা নিয়ে কথা বলি না। অনেক সময়তো স্বীকারও করি না, এমনকি আমাদের কাছের মানুষের মৃত্যুতেও।

উল্টোভাবে মৃত্যুই আমাদের জীবনে আলো হয়ে আসে, জীবনের অর্থকে নতুন করে শেখায়।

মৃত্যু না থাকলে সবকিছুকেই অবান্তর বলে মনে হবে, সব অভিজ্ঞতাকেই অপ্রয়োজনীয় লাগবে, মূল্যবোধের দরকার থাকবে না আর মানদন্ড শূন্যতে গিয়ে ঠেকবে |

আমাদের নিজেদের চেয়েও বড় কিছু

আর্নেস্ট বেকারকে বলা যায় একাডেমিক জগতেপ্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরের একজন ব্যক্তি। ১৯৬০ সালে তিনি নৃতত্ত্বে পিএইচ.ডি লাভ করেন। তার রিসার্চের বিষয় ছিল, জেন বৌদ্ধবাদের রীতি বিরুদ্ধ চর্চা আর মনোবিজ্ঞানের তুলনামূলক তত্ত্ব। সেসময় জেনবাদকে হিপ্পি আর নেশাখোরদের বিষয় বলে মনে করা হতো। সেই সাথে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণকে মনোবিজ্ঞানের একটি প্রাচীন ও বিচ্ছিন্ন শাখা বলে মনে করা হতো।

সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে ঢোকার পর পরই বেকারের কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষক মহলে। বেকারের মতো মানুষরা প্রচলিত মনোরোগবিদ্যাকে ফ্যাসিজমের অংশ বলে মনে করতো, দুর্বলের উপর অবৈজ্ঞানিক অত্যাচার হিসেবে দেখতো। সমস্যা হচ্ছে, বেকারের খোদ বসই ছিলেন একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটা ছিল প্রথম চাকরিতে গিয়ে বসকে হিটলারের সাথে তুলনা করার সমতুল্য।

বুঝতেই পারছেন, তাকে চাকরি হারাতে হয়।

বেকার তার ধারণা অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন- বার্কলি, ক্যালিফোর্নিয়া। কিন্তু লাভ হয়নি তেমন।

বেকার শুধু তার ধ্যান-ধারণার জন্যই বিপদে পড়েছিলেন, তা নয়। তার শিক্ষাদানের পদ্ধতিও অস্বাভাবিক ছিল। তিনি মনোবিজ্ঞানের ক্লাসে শেক্সপিয়রকে টেনে আনতেন, নৃতত্ত্ব পড়াতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানের বই পড়াতেন, সমাজবিজ্ঞানে নৃতাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহার করতেন। কিং লিয়ারের মতো পোশাক পরে ক্লাসে তলোয়ার যুদ্ধকে ব্যঙ্গ করতেন। কঠোর ভাষায় রাজনীতির সমালোচনা করতেন, যার সাথে পাঠের কোন সম্পর্ক নেই। তার ছাত্ররা তাকে পছন্দ করতো। আর অন্য ফ্যাকাল্টিরা করতেন ঘৃণা। বছর পার হওয়ার আগেই, আবারো চাকরি থেকে বিতাড়িত হন।

বেকার এরপর স্যান ফ্রান্সিস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যান। সেখানে তিনি একবছরের বেশি সময় চাকরি ধরে রাখেন। কিন্তু ছাত্ররা ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে নামলে বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ন্যাশনাল গার্ড চাওয়া হয়। অবস্থাও সংঘাতপূর্ণ হয়ে পড়ে। বেকার ছাত্রদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে ডিনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন (আবারও তার বসকে হিটলারের আসনে বসাচ্ছিলেন), তাকে আরো একবার বরখাস্ত হতে হয়।

বেকার ছয় বছরে চারটি চাকরি বদল করেন। পাঁচ নম্বর চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার আগেই তার কোলন ক্যান্সার ধরা পড়ে। অসুখ থেকে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। পরবর্তী বছরগুলো তিনি বিছানায় নিয়ে পড়ে থাকেন, সেরে উঠার আশা বলতে গেলে নিরাশায় পরিণত হয়েছিল। বেকার বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। মৃত্যুকে উপজীব্য করে লেখেন বইটি।

তিনি ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার বই দ্য ডিনায়াল অফ ডেথপুলিৎজার পুরষ্কার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। নৃতত্ত্ব আর মনোবিজ্ঞান, দুই জগতেই তা

ঝড় তোলে। এখনকার দিনেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। ডিয়ানাল অফ ডেথে দুটো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১. জগতে প্রাণী হিসেবে মানুষ অনন্য, কারণ আমরাই একমাত্র প্রজাতি যারা নিজেদের সম্পর্কে ধারণা রাখি, নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারি। কুকুর বসে বসে কখনো ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবে না। বিড়ালরা তাদের পূর্বের ভুল নিয়ে চিন্তা করে না এবং তারা ভিন্নভাবে কাজ করলে সামনে কী হতে পারে তা-ও ভাবে না। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে বানরের দল ঝগড়া করে না, মাছও ভাবে না তার পাখনা আরও বড় হলে, অন্য মাছেরা হয়তো তাকে আরও পছন্দ করতো।

আমরা নিজেদের মনগড়া পরিস্থিতিতে কল্পনা করতে পারি। সেটা অতীত কিংবা ভবিষ্যত দুই সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। যেখানে বাস্তবতা কিংবা পরিস্থিতি ভিন্ন হলে কী হতো সেটা চিন্তা করতে পারি। অনন্য সাধারণ এই মানসিক ক্ষমতার কারণে বেকার বলেছেন, জীবনে এক সময়ে নিজেদের মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে অবগত হয়ে পড়ি। বাস্তবতাকে ভিন্ন ভাবে কল্পনা করার শক্তি একমাত্র আমাদেরই আছে, যার ফলে এমন বাস্তবতাকেও আমরা কল্পনা করতে পারি, যেখানে খোদ আমাদেরই উপস্থিতি নেই।

আর এই উপলব্ধিকে বেকার 'মৃত্যু ভয়' নামে আখ্যা দিয়েছেন। আমরা যা কিছুই করি বা ভাবি না কেন, এই ভয় আমাদের ঘিরে রাখে।

২. বেকারের আলোচনার দ্বিতীয় অংশেবলা হয় আমাদের প্রত্যেকের দুটো 'সত্ত্বা' রয়েছে। একটা হচ্ছে বাহ্যিক সত্ত্বা-যে সত্ত্বা খায়, ঘুমায়, নাক ডাকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সত্ত্বা-আমাদের পরিচয়, আমরা নিজেদের কীভাবে দেখি।

বেকারের যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের নশ্বর দেহ একদিন মারা পড়বে এই ধারণা সবসময় বহন করে চলছি। মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়। আর এই অলঙ্ঘনীয় তাই অবচেতন মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এই কারণেই মানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ সত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। যাতে শরীর না থাকলেও তার নাম টিকে থাকে। বিল্ডিঙের গায়ে খোদাই করে, মূর্তি বানিয়ে, বইয়ের উপরে নাম লিখে রাখার বাসনার পেছনে কারণ এটাই। অন্যদের সাথে, বিশেষত শিশুদের সাথে আমরা সময় ব্যয় করি এজন্যই। যাতে আমাদের বিস্তার করা প্রভাব তাদের উপরে পড়ে। নিজেদের ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারি তাদের মধ্যে। আমরা বেঁচে না থাকলেও আমাদের প্রদত্ত শিক্ষা রয়ে যাবে। মরে গেলেও যাতে সবাই স্মরণ করা হয় আমাদের।

বেকার এই আচরণের একটা নাম দিয়েছেন, 'অমরত্বের প্রচেষ্টা'। আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্ত্বার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ইচ্ছে। তিনি বলেন, মানব সভ্যতা হচ্ছে এই অমরত্বের প্রচেষ্টার ফসল। শহর, সরকার, স্থাপনা, কর্তৃপক্ষ-এসব কিছুই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের অমরত্বের প্রচেষ্টার ফল। যীশু, নেপোলিয়ন, শেক্সপিয়ররা তাদের যুগে ততটাই প্রভাবশালী ছিলেন যতটা এখনো আছেন। বরং এখন আরো বেশি প্রভাব রাখছেন পৃথিবীতে। আসল কথাই হচ্ছে এটা। যে যেভাবে সম্ভব নিজের বিশেষত্ব তৈরি করে যায়-কেউ শিল্পে পারদর্শী হয়ে, কেউ দেশ জয় করে, কেউ বিশাল অংকের অর্থের মালিক হয়ে অথবা বড় পরিবার গঠন করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করে যায়। আমাদের জীবনই গঠিত হয় এই অমরত্বের সুপ্ত ইচ্ছেকে ঘিরে।

ধর্ম, রাজনীতি, খেলাধুলা, শিল্প আর প্রযুক্তিগত উন্নতির পেছনে এই অমরত্বের ইচ্ছের হাত রয়েছে। বেকার বলেন, যুদ্ধ-বিদ্রোহ আর গণহত্যা তখনই ঘটে যখন একদলের প্রচেষ্টার সাথে আরেক দলের প্রচেষ্টার সংঘর্ষ ঘটে। শত শত বছর ধরে চলে আসা নিপীড়ন আর রক্তক্ষয়ের পক্ষে অজুহাত হিসেবে এই অমরত্বের প্রচেষ্টাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু যখন আমাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, অমরত্বের সুধা পান করা অসম্ভব হয়ে যায় তখনই মৃত্যুর ভয়টা চুপিসারে ফিরে আসে। যার ফলে মানসিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

এখনো বুঝে না থাকলে বলে দিই, আমাদের এই অমরত্বের প্রচেষ্টাই হচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ হচ্ছে আমাদের জীবনের অর্থ পরিমাপের জন্য ব্যারোমিটার স্বরূপ। আর যখন আমাদের মূল্যবোধ কাজ করে না, আমরাও মানসিকভাবে অচল হয়ে পড়ি। বেকার যা বলতে চাইছিলেন তা হচ্ছে, আমরা ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিছু না কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করি। যাতে মরণশীলতার আতঙ্কের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারি।

মৃত্যুশয্যায় বেকার আবিষ্কার করেন, মানুষের এই অমরত্বের প্রচেষ্টাটাই আসলে সমস্যা ছিল। সমাধান না। তারা প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সত্ত্বাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে পৃথিবীজুড়ে। মানুষেরর উচিত নিজেদের ভিতরের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা আর মৃত্যুকে বাস্তবতার একটা অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। বেকার একে তেতো ওষুধ বলেছেন। তিনি নিজের ক্ষয়িষ্ণু দেহের দিকে তাকিয়ে নিজের ভিতর এই উপলব্ধি আনার চেষ্টা করে গেছেন। মৃত্যু ভয়াবহ ব্যাপার, কিন্তু অনিবার্য।

সুতরাং আমাদের উচিত হলো নিজেদের আসন্ন মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে শেখা। কারণ একবার সেটা করতে পারলেই লুকিয়ে থাকা মৃত্যু ভীতি-আতঙ্ককে জয় করে আরো স্বাধীনভাবে নিজেদের মূল্যবোধ বেছে নিতে পারবো। কারণ এখন আর অমরত্বের পিছনে ছোটার দরকার নেই, উদ্ধত দৃষ্টিভঙ্গি পালনেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

মৃত্যুর উজ্জ্বল দিক

পাথরে পা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছি, পায়ের পেশিতে টান লাগছে, ব্যথাও করছে। চুড়ার প্রায় কাছে পৌঁছে গিয়েছি। টানা পরিশ্রমে একটা সম্মোহিত অবস্থায় আছি। আকাশের বিশালত্ব আরও গভীর হয়ে উঠছে। আমি সম্পূর্ণ একা। আমার বন্ধুরা অনেক নিচে দাড়িয়ে সাগরের ছবি তুলছে।

একটা পাথরে পা রেখে উঠে তাকালাম। চারপাশের দৃশ্যটা চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ল। এখান থেকে আমি দূরসীমানায় তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছি, যেখানে পানি আর আকাশ মিশে গেছে, নীলে নীলে একাকার। বাতাসের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে চামড়ায়। মুখ তুলে তাকালাম উপরে, আকাশটা উজ্জ্বল! কী সুন্দরই না লাগছে!

আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ-এ আছি। একে একসময় আফ্রিকার দক্ষিণ সীমানা এবং পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্ত মনে করা হতো। জায়গাটায় খুবই বিপদজনক। সারাক্ষণ ঝড় বইছে, এখানকার পানিও খুনী। শতাব্দী ধরে বাণিজ্য এবং মানুষের উদ্যম অবলোকন করে যাচ্ছে। হারিয়ে ফেলা আশার জায়গায়ই বটে!

একটা পর্তুগীজ প্রবাদ আছে-এল দোব্রা ও কাবো দা বোয়া এস্পেরানসা। এই কথার মানে হলো-সে কেপ অফ গুড হোপ ধরে চক্কর দিচ্ছে। পরিহাসের বিষয়, এর অর্থ হলো, লোকটা তার জীবনের শেষভাগে দাড়িয়ে আছে, তার পক্ষে আর কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

পাথরে পা দিয়ে সামনের নীল রাজ্যে আরেকটু এগোলাম। যেন নিজেকে এর বিশালত্বের হাতে সঁপে দিচ্ছি। ঘামছি, আবার শীত শীতও করছে। এই কি শেষ?

কানে বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগছে। কিছুই শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি সীমানা দেখতে পাচ্ছিঃ যেখানে পাথরগুলো অসীমে মিলে গেছে। কয়েক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি নিচে সাগর দেখতে পাচ্ছি। মাইলের পর

মাইল জুড়ে বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ে ফেনা ভাঙছে। সামনে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে পঞ্চাশ গজ।

আমার ডানদিকে ছবি তুলতে থাকা পর্যটকদের বিন্দুর মতো লাগছে। আর বাম দিকে এশিয়া মহাদেশ। সামনে আকাশ আর পিছনে আমার সকল আশা এবং যা কিছু আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম।

যদি এই-ই সবকিছু হয়? তাহলে?

আমার চারপাশে কেউ নেই। পাহাড়ের কিনারার দিকে প্রথম কদম নিলাম মানুষের শরীরের প্রাণঘাতী বিপদের গন্ধ পাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। আপনি যখনই পাহাড়েরচূড়ার কিনারের দশ ফিটের কাছাকাছি চলে আসবেন, আপনার শরীরে এক ধরণের কম্পন সৃষ্টি হবে। পিঠ শক্ত হয়ে, চামড়ায় ঢেউ খেলে যাবে। কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও দৃষ্টি থেকে বাদ যাবে না। পা মনে হবে,জমে গেছে। মনে হবে অদৃশ্য একটা চুম্বক আপনাকে ধীরে ধীরে নিরাপদ দূরত্বে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি এই চুম্বকের আকর্ষণ উপেক্ষা করলাম। জমে যাওয়া পা দুটোকে টেনে টেনে কিনারে নিয়ে এলাম।

পাঁচ ফুট দূরত্বে এসে মনও আর আটকাতে পারে না। আপনি এখন শুধু পাহাড়ের কিনারই দেখতে পাচ্ছেন না, নিচে পুরো পাহাড়ের শরীরটাই দেখতে পাচ্ছেন। আর আপনার মনে তখনই পড়ে যাবার অপ্রত্যাশিত চিন্তা উঁকিদেবে। অনেক দূর! আপনার মন সতর্ক করার চেষ্টা করছে। এতো সত্যি সত্যি অনেক দূর! আরে করছো কী? হাঁটা বন্ধ করো! এখনই!

আমি আমার মনকে ধমক দিয়ে থামিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগলাম।

তিন ফুট দূরে এসে আপনার শরীর বিপদের লাল সঙ্কেত জ্বালিয়ে দিবে। আপনি এখন আপনার মৃত্যু থেকে একটু দূরে। মনে হবে, বাতাসের বড় এক ঝাপ্টা এলেই আপনি পড়ে যাবেন। হাত-পা দুটোই কাঁপতে থাকবে। গলার স্বরও কেঁপে যাবে। যেন এখনো মনে করিয়ে দিতে হবে আপনি মাটিতে আছড়ে পড়ে মরতে যাচ্ছেন না।

এই তিন ফুট দূরত্বটাই অনেকের জন্য চূড়ান্ত সীমা। এই তিন ফুট দূরত্বে এসে উঁকি দিলে নিচের একঝলক দৃশ্য দেখতে পারা যায়। আবার পিছলে পড়ার জন্য এই তিনফুটই অনেক দূরত্ব। পাহাড়ের এত কিনারে এসে দাঁড়ালে সামনের দৃশ্য যতই সুন্দর হোক না কেন, অনেক সময় মাথা ঘোরাতে শুরু করে। পেটের খাবার বেরিয়ে আসতে চায়।

তাহলে কি এই ছিল? যা জানার সব জেনে ফেলেছি? জীবনে এই-ই ছিল?

আমি আরেকটা ছোট পদক্ষেপ নিলাম, তারপর আরেকটা। এখন আর দুই ফুট বাকি আছে। সামনের পায়ে ভর দেয়াতেকাঁপছে। পায়ে ভার বদল করলাম। এগোচ্ছি ইন্দ্রিয়ের সতর্কবাণীর বিরুদ্ধে। জোরালো হাওয়া ভেসে এলো, চামড়ায় কেটে বসছে তীক্ষ্ণভাবে।

আর এক ফুট বাকি। আমি এখন ঢাল দিয়ে সোজা নিচে তাকিয়ে আছি। আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। আপনা থেকেই শরীর বেঁকে গেছে, যেন অদৃশ্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে রক্ষা করছে নিজেকে।

এক ফুট দূরে থেকে মনে হবে আপনি হাওয়ায় ভাসছেন। সোজা নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে আপনি আকাশেরই একটা অংশ। এসময় হয়তো পড়ে গেলেও আপত্তি থাকবে না।

আমি একটু বসলাম, শ্বাস ধরে রেখে চিন্তাগুলো মিলিয়ে নিলাম। জোর করে নিচে তাকিয়ে দেখলাম পাথরের গায়ে জলরাশি ছিটকে পড়ছে। তারপর ডানদিকে তাকিয়ে পিঁপড়ার সাইজের পর্যটকদের দেখলাম। নিচে, ফটাফট ছবি তুলছে, কেউ ট্যুর বাসের পীছনে ছুটছে। সেখান থেকে আমাকে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ। এই মুহূর্তে মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছেকে অবান্তর বলে মনে হচ্ছে। অবান্তর মনে হচ্ছে সবকিছুকেই। আমাকে এখানে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। আর দেখতে পেলেও লাভ হতো না, এতদূর থেকে তারা কিছুই করতে পারতো না।

আমি শুধু শোঁ শোঁ বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

তাহলে এই-ই ছিল?

আমার শরীর শিহরিতহয়ে গেছে। ভয় এখন আনন্দেরূপ নিয়েছে। মনের দিকে লক্ষ্য রেখে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেললাম, ধ্যান করার মতো। মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে যেভাবে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। নিজেকে সামলে নিয়ে তাকালাম আবার সামনে। আবিষ্কার করলাম, হাসছি আমি । নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম, মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছু নেই।

নিজের মরণশীলতার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছার ইতিহাস অনেক পুরানো। প্রাচীন গ্রীস আর রোমে মানুষদের সবসময় তাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। যাতে তারা জীবনকে আরো মূল্য দিতে শেখে, বিপদেও যাতে উদ্ধত না হয়ে উঠে। বৌদ্ধ ধর্মের অনেক জায়গাতেই ধ্যানের কথা বলা আছে। জীবিত অবস্থায়ই নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে ধ্যানের বিকল্প নেই। নিজের আত্মরম্ভিতাকে শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে মোক্ষলাভ করার মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, ‘মৃত্যু ভয়ের উৎপত্তি হয় জীবিত থাকার ভীতি

থেকে। যে লোক জীবনকে উপভোগ করে নিতে পারে, সে যে কোন সময়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

পাহাড়ের চূড়ায় ফিরে আসি। আমি নিচু হলাম, একটু পিছন দিকে হেলে আছি। হাতদুটো পিছনে দিয়ে মাটিতে বসলাম। নিতম্বের উপর ভার চাপিয়ে দিয়েছি। আস্তে করে একটা পাথরে পা তুলে দিলাম। পাহাড়ের একেবারে কিনারায় বসে আছি। এরপর অন্য পা'টাও তুলে দিলাম পাথরটায়। তালুর উপর ভর দিয়ে বসে রইলাম চুপচাপ, বাতাস এসে চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। এখন আর ততটা উদ্বিগ্ন লাগছে না। অন্তত যতক্ষণ দিগন্তের দিকে চেয়ে রয়েছি, শান্তি লাগছে।

সোজা হয়ে উঠে বসে আমার নিচে তাকালাম। মেরুদন্ড বেয়ে শীতল স্পর্শ নেমে গেল, সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার মন এখন সম্পূর্ণ জাগ্রত, শরীরের প্রতিটি অংশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে। ভয়টা যেন চেপে ধরতে লাগল আবার। কিন্তু যতবার ভয় চাপ দিয়ে ধরছিলো, ততবারই আমি নিজের মনকে শূন্য করে দিলাম, চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে লাগলাম। নিচের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখছি এখন, জোর করে দেখাচ্ছি আমার হবু বিপদের সম্ভাবনাকে। যেন আসন্ন বিপদের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিচ্ছি।

আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে বসে ছিলাম, কেপ অফ গুড হোপের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। পূর্বের প্রবেশপথ বলা হয় যে স্থানকে। অনুভূতিটা অবর্ণনীয়। শরীর বেয়ে উথলে উঠা অ্যাড্রেনালিনের উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। এত স্থির, এতটা চাঞ্চল্য অবস্থায়ও কখনো রোমাঞ্চ অনুভব করিনি। বাতাসের ঘাই মারার শব্দ শুনছি, সমুদ্রের রূপ অবগাহন করছি আর পৃথিবীর শেষ সীমানার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি হেসে ফেললাম। চারপাশের উজ্জ্বল আলো তার ছোঁয়া দিয়ে পবিত্র করে যাচ্ছে আশে পাশের সবকিছুকে।

আমাদের মরণশীলতার মুখোমুখি হওয়া গুরুত্ববহ। কারণ তা সব ধরণের ফালতু, ভঙ্গুর, চাকচিক্যতাকে ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে। বেশিরভাগ লোক আরেকটু বেশি টাকা, একটু খ্যাতি, একটু আকর্ষণ, একটু ভালোবাসার আবেদন পাবার জন্য ছুটে চলছে। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হলে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, আপনি পিছনে কী রেখে যাচ্ছেন?

আপনার চলে যাওয়ার পরে পৃথিবীতে কী পরিবর্তন আসবে? আপনি কীসের ছাপ রেখে যাবেন? কেমন প্রভাব ফেলে যাবেন? কথায় আছে, আফ্রিকাতে প্রজাপতির পাখা ঝাপটানোর ফলে ফ্লোরিডায় হারিকেন তৈরি হয়, আপনি কোন হারিকেন তৈরি করছেন এই মুহূর্তে?

বেকার বলে গেছেন, এটিই আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবুও আমরা মৃত্যুর চিন্তাকে এড়িয়ে যাই। এক, কারণ তা কঠিন। দুই, তা আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। তিন, আমাদের কোন ধারণাই নেই আমরা কী করছি।

আর যখনই আমরা এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাই, তখনই আমাদের ইচ্ছা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর ফালতু আর খারাপ মূল্যবোধগুলো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। মৃত্যুর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বাহ্যিক বস্তুই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আর প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো হয়ে যায় ঐচ্ছিক। মৃত্যুই একমাত্র ব্যাপার যে ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত ধারণা রাখি। আর এই জন্যই আমাদের উচিত সমস্ত মূল্যবোধ আর সিদ্ধান্ত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা। সমস্ত সমস্যার উত্তর এটাই। মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে নিজের চাইতে বেশি কিছু মনে করা। ব্যাখ্যা করে বললে, মূল্যবোধকে এমনভাবে বেছে নেয়া যাতে শুধু আপনার না, অন্যদেরও উপকার হয়। সেসব মূল্যবোধ যেগুলো সাধারণ, তাৎক্ষণিক, নিয়ন্ত্রণযোগ্য আর চারপাশের কোলাহলপূর্ণ দুনিয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চলার মতো।

জাগতিক সুখের মূলমন্ত্রই এটা। আপনি যার কথাই শুনে থাকে না কেন- এরিস্টটল, হার্ভার্ডের মনোবিদ, যীশু কিংবা বিটলস ব্যান্ড; সবাই একই কথা বলছে। সুখের উৎস অভিন্ন। শুধু নিজের কল্যাণের চিন্তা না করে অন্যের কল্যাণেও নিজেকে নিয়োগ করা। বিশ্বাস করা আপনি বিশাল কর্মযজ্ঞের ছোট্ট একটা অংশ মাত্র। আপনার ক্ষুদ্র ভূমিকা রয়েছে বড় মঞ্চে। আর এই উপলব্ধির কারণেই মানুষ গির্জায় যায়, যুদ্ধে জড়ায়, পরিবার গড়ে তোলে, পেনশনের টাকা জমায়, ব্রিজ নির্মান করে, সেলফোন আবিস্কার করে। মহৎ উদ্যোগের অংশ হওয়ার বাসনাতেই মানুষ এসব করে।

আত্মরম্ভিতা পারে মুহূর্তের মধ্যে এসব কিছু ছিনিয়ে নিতে। সমস্ত মনোযোগ আমাদের নিজেদের দিকে টেনে নেয়। আমাদের ভুল বুঝিয়ে ফেলে যে দুনিয়ার সকল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু এক আমি। শুধু আমিই নির্যাতিত হচ্ছি, অন্যদের তুলনায় আমার উচিত বেশি অধিকার পাওয়া।

আত্মরম্ভিতা আমাদের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আমাদের সমস্ত আগ্রহ আর উত্তেজনা আমাদের ঘিরেই রচিত হয়। আমাদের নিজস্ব চিন্তা- চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাই অন্যদের মাঝে। ব্যাপারটা আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। অল্প সময়ের জন্য লোভনীয়ও লাগতে পারে। কিন্তু আদতে এটা মনের জেলখানা ছাড়া আর কিছুই না।

আমাদের মাঝে এই ধারণা এখন মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এখন বিত্ত-বৈভবের অভাব না থাকলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকি বেশিরভাগ সময়ই। মানুষ এখন দায়িত্বে অবহেলা করে। সমাজ তার আবেগ আর চাহিদা মেটাবে- এমন প্রত্যাশায় ভোগে। অতি নিশ্চয়তার বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলে। নিজের এই অতি নিশ্চিত মনোভাব জোর করেই অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতায় মেতে উঠে। যা অনেক সময় সংঘর্ষে রূপ নেয়। এই মনোভাব পোষণ করে অর্থবহ কিছু করতে চাইলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মনকে সর্বদা তোয়াজ করে চলার এই প্রবণতার ফলে একদল মানুষ তৈরি হয়েছে যারা যে কোন কিছুকেই নিজের প্রাপ্য বলে বলে মনে। আদতে সেই 'কোনকিছু'র উপর তার ন্যায্য অধিকার আসলেই আছে কিনা তা চিন্তাও করে দেখে না। মানুষ নিজেদের বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সংস্কারক, যাযাবর, প্রশিক্ষক বলে দাবি করে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই। তারা এমনটা করে,কারণতারা ভাবে অসাধারণ কিছু হতে না পারলে কারো মনোযোগ পাওয়া যাবে না, সমাজ তাদের সাদরে গ্রহণ করবে না।

বর্তমানে খ্যাতি এবং সফলতা এক সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তারা মোটেই এক জিনিস নয়। আপনি ইতিমধ্যেই অসাধারণ হয়ে গেছেন। সেটা আপনি নিজে বুঝতে পারেন আর না পারেন। কিংবা অন্য কেউ বুঝুক বা না বুঝুক। আপনি আইফোন অ্যাপ বানিয়েছেন, তুখোড় মেধার জোরে একবছর আগেই স্কুল শেষ করে ফেলেছেন, বিলাসবহুল বোট কিনেছেন বলে আপনাকে অসাধারণ বলেছি-এমনটা ভাববেন না। এইসব জিনিস দিয়ে বিচার করে কেউ অসাধারণ হয় না।

আপনি ইতিমধ্যেই অসাধারণ, কারণ এত অনিশ্চয়তা আর নিশ্চিত মৃত্যুর পরেও জীবনযাপন করে গেছেন। কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন আর কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না সেটার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। আর এই ছোট্ট কথার মাধ্যমেই আপনার মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আপনাকে এই উপলব্ধি করেছে আরো সুন্দর, আরো সফল। এই উপলব্ধির কারণেই আপনি ভালোবাসা পেয়েছেন। আপনি নিজেও বুঝতে পারেননি কখনো।

আপনি একসময় মারা যাবেন। কারণ, আপনি সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যিনি বেঁচে ছিলেন। কথা শুনে না-ও বুঝতে পারেন কী বলেছি। একবার খালি পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন, বুঝে যাবেন।

বুকোওস্কি একবার লিখেছিলেন, 'আমরা সবাই একদিন মারা যাব। কী অদ্ভুত ব্যাপার'।

আমাদের উচিত একে অপরকে ভালোবাসতে শেখানো। কিন্তু সেটা হয়ে উঠে না। কারণ আমরা জীবনের তুচ্ছ সব ব্যাপারে ভয় পাই, শূন্যতা আমাদের কুরে কুরে খায়।

সেদিন রাতের কথা, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম কিভাবে প্যারামেডিকরা লেক থেকে জসের লাশ তুলে আনছে। আমার মনে পড়ে, আমি টেক্সাসের রাতের আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আমার সমস্ত আত্মরম্ভিতা আর অহংকার যেন মিলিয়ে যাচ্ছিলো অন্ধকারে। যতটা ভেবেছিলাম জসের মৃত্যু আমাকে তার চেয়েও বেশি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ এটা ঠিক, আমি সেদিন শক্ত ছিলাম, নিজের সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিলাম। লজ্জা আর সংকোচ ছাড়াই স্বপ্নকে তাড়া করতে শিখেছিলাম।

কিন্তু আরো বড় শিক্ষা লুকিয়ে ছিল এর মাঝে। আর তা হলো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই । কখনো ছিলও না। ধ্যানের মাধ্যমে, দর্শনশাস্ত্র পড়ার মাধ্যমে, দক্ষিণ আফ্রিকার পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো পাগলামি করে আমি নিজেকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিতাম মৃত্যুর কথা। মনকে কেন্দ্রীভূত রাখতে এই ভাবনার কোন বিকল্প ছিল না। নিজের ভঙ্গুরতা, মৃত্যুচিন্তা যেন আর বাকি সব কিছুকে সহজ করে দিয়েছিলো। নেশার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলাম, নিজের আত্মরম্ভিতা আর অহমিকাকে চিনতে পেরেছিলাম, নিজের সমস্যার দায়িত্ব নিজে নিতে শিখেছিলাম, ভয় আর অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলতাম।ব্যর্থতাকে মেনে নিতে আর প্রত্যাখ্যানকে স্বীকার করতে পারতাম। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে মৃত্যুচিন্তার বদৌলতে। আমি যতই আঁধারে উঁকি দিতাম, আমার জীবন ততই আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত; পৃথিবী যতই নীরব হয়ে পড়তো, প্রতিবন্ধকতা ততই কম অনুভব করতাম।

আরো কয়েক মিনিট বসে রইলাম, চারপাশটা দেখে নিচ্ছি মন ভরে উঠে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পিছনের হাতে ভর করে ঘষটে সরে এলাম। এরপর আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। আশে পাশে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছি আলগা পাথরর পড়ে আছে কিনা, পিছলে না পড়ি আবার। কোথাও কোন সমস্যা নেই নিশ্চিত হয়ে পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করলাম। ফিরে যাচ্ছি বাস্তবে। পাঁচ ফুট, দশ ফুট, শরীর ঢিল দিতে লাগল দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে। পা দুটোও হালকা হয়ে এসেছে। নিজেকে চুম্বকের আকর্ষণের দিকে নিয়ে চললাম।

মূল রাস্তার দিকে এগোতেই দেখলাম, একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমিও থেমে তার দিকে তাকালাম।

'ইয়ে...আপনাকে চুড়ার ধারে ওখানে বসে থাকতে দেখেছি।' উচ্চারণের ধরণ শুনলেই বোঝা যায় অস্ট্রেলিয়ান। তিনি খুব হাস্যকর ভাবে 'ওখানে' শব্দটা বললেন।এন্টার্কটিকার দিকে হাত উঁচিয়ে রেখেছেন।

'হ্যাঁ। দৃশ্যটা দারুণ, তাই না?'আমি হাসলেও তিনি হাসছেন না। মুখে চিন্তার ভাঁজ।

শর্টসে হাতদুটো ঝেড়ে নিলাম। আমার শরীর এখনো ঝিম ঝিম করছে অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল।

অস্ট্রেলিয়ান লোকটা হতবিহবল হয়ে দাড়িয়ে রইল। এখনও আমার দিকে তাকিয়ে ভাবছে কি বলবে। কিছুক্ষণ পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সবকিছু ঠিক আছে?

আমি একটু সময় নিয়ে হাসি দিয়ে বললাম,'বেঁচে আছি'।

তার মুখে সন্দেহের ছায়া সরে গিয়ে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে মাথা দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি। অবারিত সৌন্দর্য্য দেখে নিচ্ছি প্রাণভরে। অপেক্ষা করছি কখন আমার বন্ধুরা এসে যোগ দেবে।

---সমাপ্ত---